রামানুজ চরিত

স্বামী প্রেমেশানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী প্রেমেশানন্দ-প্রণীত 'রামানুজ-চরিত' পুস্তকখানি ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে অধুনা বাংলাদেশস্থ টাঙ্গাইল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইলে বহুকাল ইহা অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। সংক্ষিপ্ত সরল এই জীবনচরিতখানির উপযোগিতা চিন্তা করিয়া আমরা ইহার পুনঃ-প্রকাশে উৎসাহিত হইলাম।

লেখকের অন্যান্য চরিতগ্রন্থগুলির মতো এই পুস্তকখানিরও সমান সমাদর হইবে, ইহাই আশা করি।

২০ ফাল্গুন, ১৩৯০

প্রকাশক

লেখকের কথা

বহুবর্ষ পূর্বে অবতারগণের জীবন-চরিত ক্ষুদ্রাকারে লিখিবার সংকল্প করিয়াছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও দশাবতার চরিতের পর, ১৩৩৪ সনে, উদ্‌বোধন কার্যালয় হইতে, শঙ্কর চরিত প্রকাশিত হয়। অনেক দিন পর, ১৩৪৫ সনে, আচার্য রামানুজের জীবন-চরিত লিখিবার সুযোগ পাই ; কিন্তু, তাহা প্রকাশের উপায় করিতে পারি নাই।

আমাকে নিরুৎসাহ দেখিয়া, ১৩৫১ সনে, শ্রীমান্ বিপদ ভঞ্জন গোস্বামী ইহা প্রকাশের উদ্যম করেন। তিনি নানা চেষ্টা করিয়া অবশেষে, টাঙ্গাইল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক শ্রীমান্ সুবোধ চন্দ্র দে-কে প্রকাশের ভার লইতে অনুরোধ করেন। সুবোধ বাবু প্রকাশের ভার লইলেন বটে, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের গোলমালে তাহাকেও বিরত হইতে হইল। অবশেষে, বহু বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রায় দশ বৎসর পর, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানা প্রকাশিত হইল।

আমার অনেক বন্ধু বান্ধব, নানা ভাবে, এই পুস্তক প্রকাশে সাহায্য করিয়াছেন। মামুলী ধন্যবাদ তাহাদের নিকট উপহাসের মত শুনাইবে ; দীর্ঘকাল প্রতীক্ষিত পুস্তকের প্রকাশ দেখিয়াই তাহারা তুষ্ট হইবেন, আশা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
সারগাছি, মুর্শিদাবাদ
১লা আষাঢ়, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

বিনীত
প্রেমেশানন্দ।

রামানুজ চরিত

প্রথম অধ্যায়

(১)

বাল্য

যে সকল মহাপুরুষের চরিত্র প্রভাবে ভারতের জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, আচার্য রামানুজ তাঁহাদের অন্যতম। এস নবযুগের তরুণগণ, এই বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের দিনে, সেই মহাপুরুষের অতি মনোহর ও শিক্ষাপ্রদ জীবন-কথা আমরা আজ একবার স্মরণ করি।

এক হাজার বৎসর পূর্বের কথা। মাদ্রাজ শহর হইতে প্রায় ২৮ মাইল দূরে, শ্রীপেরেমবুদুর নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে, সদাচার-সম্পন্ন অনেক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তথায় কেশব দীক্ষিত নামে জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সর্বদা যাগযজ্ঞ করিতেন, তাই লোকে তাঁহাকে 'সর্বক্রতু'* এই উপনাম দিয়াছিল। পরম বৈষ্ণব শ্রীশৈলপূর্ণের ভগিনী কান্তিমতীকে তিনি বিবাহ করেন। কান্তিমতীর গর্ভে, ১০১৭ খৃস্টাব্দে আচার্য রামানুজ জন্ম গ্রহণ করেন।

বালক রামানুজ যেমন সুশ্রী. তেমনই সুস্থ ও সবল ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ ; যাহা একবার শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। তাঁহার মধুর ও নম্র ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। উপনয়নের পর, পণ্ডিত কেশব নিজেই তাঁহাকে বেদ ও বেদাঙ্গ পড়াইতে লাগিলেন। মেধাবী শিশু অল্প কালেই অনেক বিষয় শিক্ষা করিলেন। পরন্তু, পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সু-দৃষ্টান্ত অনুকরণে, তিনি বাল্যকাল হইতেই ভাবুক, প্রেমিক ও ভক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

---

* ক্রতু—বৈদিক যজ্ঞ।

কাশীর বিশ্বনাথ ও পুরীর জগন্নাথ দেবের ন্যায় কাঞ্চীপুরের শ্রীবরদরাজ নামক বিষ্ণুমূর্তি বড়ই জাগ্রত দেবতা। পেরেমবুদুর গ্রামের নিকটবর্তী পুনামেলি গ্রামের কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজের পরম ভক্ত বলিয়া, প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। লোকে বিশ্বাস করিত, বরদরাজ তাঁহার সঙ্গে কথা বলেন। কাঞ্চীপূর্ণ, নিত্যই, কেশবের বাটীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া, বরদরাজের মন্দিরে যাতায়াত করিতেন। বালক রামানুজ এই মহাপুরুষের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাকে বাড়িতে ডাকিয়া আনিয়া সেবাযত্ন করিতেন এবং তাঁহার মুখে ভগবানের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইতেন।

ষোল বৎসর বয়সে রামানুজের বিবাহ হয়। বিবাহের অল্প কাল পরে কেশব সহসা দেহ ত্যাগ করেন। এই ঘটনায় রামানুজ ও তাঁহার মাতা কান্তিমতী অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া পড়েন। কেশবের স্মৃতি-বিজড়িত পেরেমবুদুর গ্রাম ত্যাগ করিলে হয়তো তাঁহার অভাব-বোধ কিছু হ্রাস পাইতে পারে, এই ভাবিয়া মাতা, পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া, কাঞ্চীনগরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে, যাদব প্রকাশ* নামক জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত-সন্ন্যাসী কাঞ্চীপুরে বেদান্তাদি নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। রামানুজ তাঁহার নিকট পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে, রামানুজের মাসতুত ভাই গোবিন্দ আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিল এবং যাদবের টোলে ভর্তি হইল।

(২)

সমাজ

তদানীন্তনের লোক প্রচলিত সামাজিক নিয়ম ও ধর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। ভারতের ঐ অঞ্চলেও তখন সামাজিক রীতি-নীতিতে খুব কঠিন গোঁড়ামি থাকায় ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মধ্যে আচারে ব্যবহারে ও মেলামেশাতে ঘোরতর অমিল ছিল। শৈব ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষী ভাব তখন চরমে উঠিয়াছিল।

---

* 'প্রকাশ' উপনামটি দশনামী সন্ন্যাসীদের গোবর্ধন মঠে, ব্রহ্মচারীরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাদব হয়তো ব্রহ্মচারী ছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই।

রামানুজ যখন যাদবের টোলে পড়িতেছিলেন, তখন কাঞ্চীতে শৈবগণ পণ্ডিত-সন্ন্যাসী যাদব প্রকাশের অধীনে প্রবল হইয়া উঠেন। সুতরাং সেখানে বৈষ্ণবগণ সংকুচিত হইয়া বাস করিতেন। আবার, শ্রীরঙ্গম নগরে, মহা-পণ্ডিত ও ত্যাগী সিদ্ধপুরুষ যামুনাচার্যের প্রভাবে, বৈষ্ণবগণ গৌরবান্বিত ও শৈবগণ দুর্বল ছিলেন।

(৩)

গুরুশিষ্য

স্বামী যাদব প্রকাশ কাঞ্চীপুরে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। রামানুজ উৎসাহের সহিত, তাঁহার নিকট বেদান্ত পাঠ আরম্ভ করিলেন এবং সযত্নে গুরুর সেবা করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। মেধাবী ছাত্র পাইলে গুরুর উৎসাহ বাড়ে ; বিশেষতঃ রামানুজের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন ছাত্র দুর্লভ। সুতরাং স্বামীজীও খুব উৎসাহের সহিত ছাত্রটিকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রামানুজের এক আত্মীয়-তনয় সরলবুদ্ধি গোবিন্দও তাঁহার নিকট পড়িতে লাগিল। গোবিন্দ রামানুজকে প্রাণাধিক ভালবাসিতেন।

কিন্তু ছাত্র ও শিক্ষকের এই ভালবাসায় একটি মহা বিঘ্ন উপস্থিত হইল। রামানুজ বুদ্ধিমান ও ভক্ত ; আর, যাদব ভক্তিহীন ও তার্কিক। যাদব ভগবানের মহিমা ও মাধুর্য বুঝিতে পারিতেন না। তিনি রামানুজের ভগবদ্‌ভক্তি নিতান্ত বোকামি মনে করিতেন এবং তাঁহাকে শুষ্ক জ্ঞান বিচারের পথে আনিবার চেষ্টা করিতেন। ইহাতে রামানুজ বড়ই উত্ত্যক্ত হইতেন।

একদিন রামানুজ যাদবের গায়ে তৈল মাখাইতে ছিলেন এবং যাদব একটি শিষ্যকে উপনিষদের একটি বাক্য বুঝাইতে ছিলেন। ঐ বাক্যে বলা হইয়াছে, নারায়ণের চোখ দুইটি পদ্মের ন্যায়, আর ঐ পদ্ম কপ্যাসের ন্যায়। যাদব বলিলেন, কপি শব্দে বানর বুঝায় এবং আস শব্দের অর্থ নিতম্ব। সুতরাং কপ্যাস শব্দের অর্থ, বানরের পশ্চাদ্‌ ভাগ।* নারায়ণের চক্ষু দুইটি বুঝাই-

---

* ছান্দোগ্য উপনিষৎ ১।৬।৭ তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী। কপ্যাসং পুণ্ডরীকং যথা, এবং তস্য অক্ষিণী—কপ্যাস (লোহিতবর্ণ) পদ্ম যেমন, সেইরূপ তাঁহার চক্ষু দুইটি। কপি-আস=কপ্যাস।

বার জন্য, জগতের সব ভাল ভাল বস্তু ছাড়িয়া, বানরের নিতম্বের উপমা দেওয়াতে, রামানুজ বড়ই ব্যথিত হইলেন ; এমন কি, তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। হৃদয়হীন শুষ্ক যাদব, রামানুজকে কাঁদিতে দেখিয়া খুব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আচার্য শঙ্কর এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, ইহা তো আমি কল্পনা করিয়া বলিতেছি না।" রামানুজ বলিলেন, "আচার্যদেব ইচ্ছা করিলে, ইহার সদর্থও করিতে পারিতেন।" এই কথায় যাদব আরও রাগিয়া বলিলেন, "ইহা যদি কদর্থ, তবে সদর্থটা কি হইতে পারে তুমি-ই বল।" রামানুজ বলিলেন, "আপনার আশীর্বাদে, ইহার সুন্দর অর্থও হইতে পারে। ক অর্থ জল, তাহা যিনি পান বা শোষণ করেন তিনি কপি, অর্থাৎ সূর্য। আস শব্দ বিকশিতও বুঝায়। সুতরাং কপ্যাস শব্দের অর্থ সূর্য দ্বারা বিকশিত।

এই অর্থ খুব সুন্দর হইল বটে, কিন্তু যাদব ইহাতে সুখী হইতে পারিলেন না। তাহার ব্যাখ্যার নিন্দা করিয়া নূতনভাবে এমন সুন্দর অর্থ করাতে, অহঙ্কারী পণ্ডিতের মন অভিমানে ও ঈর্ষায় জ্বলিতে লাগিল।

(৪)

অনলে ঘৃতাহুতি

যাদবের অভিমানে আঘাত লাগিবার আর একটি গুরুতর কারণ উপস্থিত হইল। কাঞ্চীপুরের রাজকন্যার দেহে এক ব্রহ্মদৈত্যের আবেশ হয়। অনেক চিকিৎসাতেও মেয়েটি সুস্থ হইল না। সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলে ভূত পালায় ; বিশেষতঃ যাদব মন্ত্র-তন্ত্রও জানিতেন। তাই রাজা মেয়েটির চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। যাদব অনেক শিষ্য সহ, বেশ আড়ম্বরের সহিত, রাজবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ব্রহ্মদৈত্য যাদবের তুক্‌তাক্, ঝাড়-ফুঁক সবই হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে খুব উপহাস করিতে লাগিল। শিষ্যদের সঙ্গে রামানুজও উপস্থিত ছিলেন। দৈত্য তাঁহাকে দেখাইয়া বলিল, "যদি এই ব্রাহ্মণ আমার মাথায় পা দেন, তবে আমি রাজকন্যাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।" গুরুর আদেশে রামানুজ মেয়েটির মাথায় পা দিলে সে সত্য সত্যই সুস্থ হইয়া উঠিল। রামানুজের এই আশ্চর্য প্রভাব দেখিয়া সকলেই

তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিল। গুরু ও শিষ্য উভয়কে রাজা অনেক ধনরত্ন দিলেন। রামানুজ নিজে কিছুই গ্রহণ করিলেন না ; সমুদয় গুরুচরণে অর্পণ করিলেন। কিন্তু গুরু তুষ্ট হইলেন না, ঈর্ষার অনল তাঁহার হৃদয়ে আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

(৫)
প্রতিকার

শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় রামানুজের প্রতিভা দিন দিন যতই বাড়িতে লাগিল, যাদবের সঙ্গে তাঁহার মতভেদও ততই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। রামানুজের রূপ, মধুর চরিত্র ও গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের নিকট যাদবের ভক্তিহীন পাণ্ডিত্যের গৌরব যে অচিরেই ম্লান হইয়া পড়িবে, সেই বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। তখন যাদবের অন্তরের পশু জাগিয়া উঠিল, রামানুজের অস্তিত্ব তাঁহার অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। বিষম মর্মবেদনায় কাতর হইয়া, তিনি একদিন তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। তিনি শিষ্যগণকে বুঝাইলেন, "ভগবান্ শঙ্করাচার্য শিবের অবতার, তিনি যে ধর্ম-মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত মানুষের কল্যাণের আর কোনও উত্তম উপায় নাই। কিন্তু রামানুজ আচার্যদেবকে মানে না, তাঁহার মতের নিন্দা করে, পরন্তু শাস্ত্রের নানারূপ কদর্থ করে। সে হয়তো ভবিষ্যতে আচার্য-মতের বিরোধী নূতন মত প্রচার করিয়া মানুষের অত্যন্ত অমঙ্গল করিবে। আর যাদব মরিয়া গেলে, রামানুজের মতো প্রতিভাশালী লোকের সঙ্গে তর্কবিচার করিয়া, আচার্যের মত রক্ষা করা খুবই কঠিন হইবে......ইত্যাদি।"

গুরুদেবের সহিত একমত হইয়া শিষ্যগণ অনেক আলোচনা করিয়া স্থির করিল, রামানুজকে হত্যা করা ছাড়া আচার্যদেবের মত রক্ষার অন্য কোনও উপায় নাই ; আর, বহু লোকের কল্যাণের জন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করিলে পাপও হয় না ; ভগবানের অবতারগণের জীবনে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু আর একটি সমস্যা দাঁড়াইল এই যে, এই লোকটা কাঞ্চী-নগরে বড়ই বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে ; ইহাকে হত্যা করা সহজ ব্যাপার নহে। তখন, আবার অনেক গবেষণার পর সিদ্ধান্ত হইল, শিষ্যগণ গুরুর সঙ্গে দল বাঁধিয়া তীর্থদর্শনে বাহির হইবে এবং পথে সুযোগ অনুসারে রামানুজকে

হত্যা করিবে ; তারপর কাশীধামে গিয়া গঙ্গাস্নান করিলেই ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর হইয়া যাইবে।

চমৎকার ব্যবস্থা বটে! পাপপুণ্য কিসে হয় বা না হয়, সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং কতকগুলি শ্রুতি-মনোহর যুক্তি দাঁড় করাইতে পারিলে, পুণ্যের নাম করিয়া, মানুষকে দিয়া সকল প্রকার দুষ্কার্যই করানো সম্ভব হয়। ধর্মের ভাঁওতায় জগতে কতই না হত্যা, অবিচার, অত্যাচার হইয়া থাকে! আর, মানুষ হুজুগ বড় ভালবাসে ; দুষ্টবুদ্ধি অসুরগণ তাহাদের এই দুর্বলতার সুযোগ চিরকাল খুঁজিয়া বেড়ায়।

(৬)

ধর্মের ভান

যাদবের বহুকাল বিস্মৃত ধর্মভাব হঠাৎ যেন জাগিয়া উঠিল। তিনি মাঘ মাসে প্রয়াগে কল্পবাস* করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অনুগত শিষ্যগণ গুরুর সঙ্গে তীর্থযাত্রার এই শুভ সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইল। তাহারা রামানুজকে কৃত্রিম ভালবাসা দেখাইয়া তাহাদের সঙ্গে যাইতে সম্মত করাইল। রামানুজের মাসতুত ভাই গোবিন্দও তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিল।

তখনকার দিনে, পায়ে হাঁটিয়া তীর্থে যাইতে হইত। কয়েক দিন চলিবার পর, যাত্রিদল বিন্ধ্য পর্বতের নিকট গোণ্ডারণ্য নামক ভীষণ বনে প্রবেশ করিল। সরলমতি গোবিন্দ একদিন শুনিতে পাইল, সতীর্থগণ রামানুজকে মারিয়া ফেলিবার পরামর্শ করিতেছে। কোনও সুযোগে সে রামানুজকে এই কথা জানাইল। আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া রামানুজ অগত্যা খুব নিবিড় বনের ভিতর পলায়ন করিলেন। যাদবের দল তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তিত হইল, দুঃখের ভান করিয়া অনেক খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিল ; কিন্তু এই ভীষণ অরণ্য মধ্যে পলাইবার কোনও পথ দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন তাহারা এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল যে, কোনও হিংস্র জন্তু নিশ্চয়-ই রামানুজকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

---

* কল্পবাস—সংকল্প করিয়া কোনও নির্দিষ্ট কাল বাস করা।

রামানুজ সভ্য জন্তুর হাত হইতে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু বন্য জন্তু হইতে অব্যাহতি লাভের কোনও পথ দেখিতে পাইলেন না ; যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নিবিড় হইতে নিবিড়তর অরণ্যই কেবল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তিনি ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া যথাসাধ্য সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপ চলিতে-চলিতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া যখন একান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি সহসা দেখিতে পাইলেন, এক ব্যাধ সেই গভীর অরণ্যে শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া অবাক্। এমন সুন্দর পুরুষের এই দুর্দশা দেখিয়া, ব্যাধের মনে দয়া হইল। সে এক অতি সংক্ষিপ্ত বন্যপথে তাঁহাকে লইয়া গিয়া, কাঞ্চী-নগরে পেঁাছাইয়া দিল। এত শীঘ্র রামানুজকে একাকী ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া, সকলেই কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রামানুজ বলিলেন, গোণ্ডারণ্যের নিবিড় বনে পথ হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে, অবশেষে এই কাঞ্চীতে আসিয়া পড়িয়াছেন।

(৭)

"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ, তথা মানাপমানয়োঃ"

তীর্থদর্শনের অভিনয় করিয়া যাদব যথাকালে দেশে ফিরিয়া জানিলেন, রামানুজ পথ হারাইয়া তাঁহার পূর্বেই দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কী ভয়ঙ্কর কথা! সংবাদটি শেলের ন্যায় তাঁহার বুকে বাজিল। তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রামানুজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্বের ন্যায় যথোচিত শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিলেন। যাদব ভাবিলেন, "রামানুজটা তো একেবারেই বোকা, সুতরাং আমার মতো চতুর লোকের মনোভাব সে বুঝিতে পারিবে কেন?" তিনি নিশ্চিন্ত রহিলেন।

দুষ্টামিটা ভালরূপে চাপা দিবার জন্যই হউক, অথবা রামানুজকে সংহার করিবার নূতন পথ বাহির করিবার জন্যই হউক, যাদব খুব আদর করিয়া, পাঠ আরম্ভ করিবার জন্য রামানুজকে অনুরোধ করিলেন। রামানুজ, অম্লান বদনে, প্রশান্ত চিত্তে, আবার টোলে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন।

রামানুজের মন যে কত নির্মল ছিল, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। কেহ একটা কটু কথা বলিলে, আমরা তাহা সারা জীবন ভুলিতে পারি না, প্রাণান্তকর শত্রুকে ক্ষমা করা তো দূরের কথা। শাস্ত্রে লিখিত আছে, ভগবানে ভক্তি হইলে শত্রু-মিত্র জ্ঞান থাকে না, সকল জীবকে সুহৃৎ বলিয়া মনে হয় ; আর, ভক্তিহীন মানুষে আর পশুতে বিশেষ তফাৎ নাই ; কারণ, স্বার্থে আঘাত লাগিলে উভয়ই নির্মম ও হিংস্র হইয়া উঠে ; ভক্তিহীন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, সমাজে মহা অশান্তি উপস্থিত হয় ; তখন, রামানুজের ন্যায় মহাপুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া মানুষকে সুখ-শান্তি লাভের পথ প্রদর্শন করেন।

আলো অন্ধকার এক স্থানে থাকিতে পারে না। যাদবের সহিত রামানুজের মতবিরোধ অল্পকাল মধ্যেই আবার প্রকাশিত হইল। ভক্তি ছাড়িয়া, শাস্ত্রের কথা নিয়া, কেবল চুল-চেরা বিচার, রামানুজের মোটেই ভাল লাগিল না। যাদবও রামানুজের ভগবদ্‌ভক্তি একেবারেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের গুপ্ত বিষ আবার ব্যক্ত হইল ; তিনি, রামানুজকে অপমানিত করিয়া, তাঁহার আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

(৮)

আদর্শ

বর্তমান সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অবধি নাই। কিন্তু চরিত্র কিরূপে মহৎ হয়, মন কিরূপে শান্ত হয়, এই সব দিকে মানুষের দৃষ্টি অত্যন্ত কম। রামানুজের সময়েও সমাজের অবস্থা এইরূপ-ই হইয়াছিল। তখন যাদবের মতো নরপশুও সাধু-সমাজে উচ্চস্থান পাইত এবং শাস্ত্রজ্ঞের গৌরবে সম্মানিত হইত। বিপথগামী সমাজকে যিনি পথ প্রদর্শন করিতে আসিয়াছেন, সমাজের কোথায় কিরূপ ব্যাধি, ইহা তাঁহার ভালরূপেই জানা আবশ্যক। তাই বুঝি ভগবানের ইচ্ছায়, রামানুজের মনে শাস্ত্রজ্ঞান লাভের এইরূপ অদমনীয় আকাঙ্ক্ষা এবং এই সূত্রে যাদবের সহিত তাঁহার মিলন। যাদবের চরিত্রে তিনি সাধনহীন শাস্ত্রজ্ঞানের ব্যর্থতার ও ভক্তিহীন মানুষের পশুত্ব প্রাপ্তির চরম নিদর্শন দেখিতে পাইলেন।

এই কঠিন আঘাতে রামানুজের শাস্ত্রজ্ঞান লাভের মোহ কাটিয়া গেল।

আজ বড় ব্যথিত হৃদয়ে, শান্তিলাভের জন্য, তিনি কাঞ্চীপূর্ণের নিকট ছুটিয়া গেলেন। বাল্যকাল হইতেই, তিনি ইঁহাকে খুব ভক্তি করিতেন। তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গে শ্রীবরদরাজ কথা বলেন। তাই ধর্ম বিষয়ে কোনও সংশয় উপস্থিত হইলেই, তিনি বরদরাজের মত জানিবার জন্য কাঞ্চীপূর্ণের নিকট যাইতেন। কাঞ্চীপূর্ণও এই মেধাবী, অত্যন্ত সরল এবং ভগবদ্‌ভক্ত ব্রাহ্মণ যুবককে খুব ভালবাসিতেন।

শাস্ত্রচর্চার মোহঘোরে, যাদবের সঙ্গে, রামানুজের এতকাল কাটিয়া গিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, যাদব-চরিত্রের সমালোচনা এতদিন তাঁহার মনে একবারও উঠে নাই। কিন্তু আজ যেন আপনা হইতেই, যাদব ও কাঞ্চীপূর্ণ এই উভয় চরিত্রের দুইটি ভিন্ন চিত্র তাঁহার নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। একদিকে, অসামান্য প্রতিভাবান্ পণ্ডিত, রাজা হইতেও অধিক সম্মানিত, কিন্তু মান-যশের কাঙ্গাল, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি হীন মনোবৃত্তির দাস, ঈশ্বরে ভক্তিহীন,—সেইজন্য, অন্তরে অবলম্বনহীন শুষ্কহৃদয় যাদব। অন্যদিকে, নীচ জাতীয়, মূর্খ, বাহ্য দৃষ্টিতে দীনহীন, কিন্তু ভগবৎ-শক্তিতে অসীম শক্তিমান এবং সকল প্রকার নীচতা, হীনতা ও দুঃখ-বেদনার ঊর্ধ্বে অবস্থিত কাঞ্চীপূর্ণ।

যাদবের সকল গৌরব তাঁহার নিকট আজ একান্ত ম্লান, তুচ্ছ, হেয় ও আকর্ষণহীন বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, যাদব কেবল 'কথার বোঝা' বহিয়া জীবন বৃথা ক্ষয় করিতেছেন, আর কাঞ্চীপূর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন, কাঞ্চীপূর্ণের জীবনের মহান্ আদর্শে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে,—সেখানে অন্য আদর্শের আর স্থান নাই। ভগবান্-লাভ ব্যতীত মানবজীবনের আর অন্য উদ্দেশ্য হইতেই পারে না,—ইহা সুস্পষ্টই তিনি আজ বুঝিতে পারিলেন।

কাঞ্চীপূর্ণের পূত-সঙ্গে, এই শুদ্ধচিত্ত ভক্তিকোমল হৃদয়ের গ্লানি দূর হইতে বেশি সময় লাগিল না। রামানুজ যখন যে বিষয়ে মন দিতেন, তখন তাহাতেই তন্ময় হইয়া যাইতেন। পূর্বে যেমন পাঠে তন্ময় ছিলেন, এখন ভগবানের চিন্তায় তেমনই ডুবিয়া গেলেন।

ইহার কিছুদিন পরে, তাঁহার মাতা ইহলোক ত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১)

বৈষ্ণবাচার্য যামুন মুনি

যামুনাচার্য, পান্ড্য রাজ্যের রাজধানী মদুরা নগরে, এক ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলে, জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঈশ্বর মুনি, পুত্রের জন্মের অল্প কাল পরেই, পরলোক গমন করেন। পিতামহ সিদ্ধযোগী নাথমুনি তাঁহাকে লালনপালন করেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হয়। তাঁহার জীবনের ঘটনাসমূহ উপন্যাসের ন্যায় মনোহর।

তখনকার দিনে পণ্ডিতদের ভারী সম্মান ছিল। বিশেষতঃ যাঁহারা কূট তর্ক করিয়া অন্যের মত ভুল বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেন, সেই সব তার্কিক পণ্ডিত, রাজার মতো সম্মান পাইতেন। পান্ড্য দেশের রাজার সভা-পণ্ডিত ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ তার্কিক। তিনি সেই দেশের প্রায় সকল পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে বার্ষিক কর আদায় করিতেন। লোকে তাঁহাকে নাম দিয়াছিল, "বিদ্বজ্জন-কোলাহল" ; কারণ, তিনি বিদ্বানগণের মধ্যে কোলাহল উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে কাহারও কথা কহিবার উপায় ছিল না। তাঁহার নিকট যদি কোনও মত কেহ প্রকাশ করিত, তিনি ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিবলে, তাহা ভ্রম বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতেন।

বালক যামুন ভাষ্যাচার্য নামক একজন পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্র পাঠ করিত। বলা বাহুল্য, ভাষ্যাচার্যও কোলাহল শর্মাকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক সময় দুই তিন বৎসর কর দিতে পারেন নাই। একদিন ভাষ্যাচার্য বাড়ী ছিলেন না, এমন সময় কোলাহলের এক শিষ্য আসিয়া বার্ষিক করের জন্য খুব কটু কথা বলিতে লাগিল। বালক যামুন, ভন্ড গুরুর ষন্ড চেলাকে যথোচিত উত্তর দিয়া বলিল, "তোমার গুরুর যদি সাহস থাকে, আমার সঙ্গে তর্ক করুন। আমি কেমন গুরুর শিষ্য, তাঁহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিব।" বালকের এইরূপ অসীম সাহসের কথা শুনিয়া, কেহ ছেলেমানুষি, কেহ জ্যাঠামি মনে করিলেন। কিন্তু রাজা ধৃষ্টতার জন্য ছেলেটিকে শাস্তি

দেওয়া কর্তব্য ভাবিয়া, তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভাষ্যাচার্য ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বালক বিন্দুমাত্রও ভীত হইল না, বরং গুরুকে নানা প্রকারে আশ্বাস দিতে লাগিল।

দেশের অনেকেই কোলাহল শর্মাকে ঘৃণা করিত। অহঙ্কারী, বিশেষতঃ পরকে অপমানকারী লোককে কে ভালবাসে? ছোট একটি ছেলে এত বড় পণ্ডিতের সহিত তর্ক করিতে আসিতেছে, এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং এই বিষয় নিয়া সর্বত্র বেশ একটি আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। কোলাহলের শত্রুগণ বলিতে লাগিল, বামন যেমন বলিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এই বালকও সেইরূপ দাম্ভিক পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ করিবে। রানী এই মতাবলম্বী হইলেন। কিন্তু রাজা ছিলেন কোলাহলের গোঁড়া ভক্ত ; তিনি পণ্ডিতের পরাজয় সম্ভাবনা কল্পনাও করিতে পারিলেন না। রাজা ও রানীতে এই বিষয় নিয়া খুব তর্ক বাধিল। রানী বলিলেন, "যদি এই বালক তর্কে হারিয়া যায়, তবে, আমি সিংহাসন ছাড়িয়া আপনার দাসীর দাসী হইব।" রাজাও পণ করিলেন, "যদি কোলাহল শর্মা হারেন, তবে আমার রাজ্যের অর্ধেক এই বালককে দিব।"

শিশু যামুন রাজসভায় উপস্থিত হইলে, তাহার ক্ষুদ্র মূর্তি দেখিয়া, সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল। বালক গম্ভীর ভাবে সভায় বসিয়া, পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে আহবান করিল। পণ্ডিত, অতি অবজ্ঞার সহিত, যামুনকে ব্যাকরণের সামান্য নিয়ম ও শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বালক সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিল, "আপনি অবহেলা করিয়া আমাকে সামান্য-সামান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কিন্তু শরীর বড় হইলেই যদি জ্ঞান বেশি হইত, তবে একটি ষাঁড় আপনা হইতে বেশি জ্ঞানী হইত। এখন, আমি আপনার নিকট আমার কয়েকটি মত বলিতে চাই। আপনি তাহা খণ্ডন করিতে পারিলে, আমি পরাজয় স্বীকার করিব।"

কোলাহল শর্মা ভাবিলেন, "বালক এমন কি মত প্রকাশ করিবে, যাহা আমি খণ্ডন করিতে পারিব না! কত মহাপণ্ডিতের মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছি। আমার পক্ষে এই শিশুর মত খণ্ডন করিতে যাওয়াই এক অপমান। এই শিশুর সঙ্গে আমার মতো মহাপণ্ডিতের তর্কযুদ্ধ দেখিতে কৌতূহলী হইয়া শত শত লোক আজ রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের

বর্ধিত কৌতূহলের সম্মুখে বালককে অবহেলা করিয়া প্রত্যাখ্যান করাও সম্ভব নহে।" এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া, পন্ডিত বাধ্য হইয়া, যামুনের সহিত তর্কযুদ্ধে সম্মত হইলেন।

তখন, বালক নিম্নলিখিত তিনটি অদ্ভুত মত তাঁহার নিকট প্রকাশ করিল। হয়, মতগুলি ভুল বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে, নয়, মানিয়া লইয়া পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে।

১। আপনার মাতা বন্ধ্যা নহেন।
২। পান্ড্য দেশের রাজা পরম ধার্মিক।
৩। পান্ড্যরাজ-মহিষী সতী।

কোলাহল শর্মা, তর্কশাস্ত্রের কূট কৌশল অবলম্বনে, সরল সত্যাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত খন্ডন করিয়া, তাঁহাদিগকে অপমানিত করিতেন। তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার প্রথা ছিল না ; পন্ডিত-দের সভায় শাস্ত্রবিচার করিয়া পন্ডিতগণকে নিজ পান্ডিত্যের প্রমাণ দিতে হইত। কালক্রমে এই প্রথা কুপ্রথায় পরিণত হইল ; তার্কিকগণ নানারূপ পণ রাখিয়া, পালোয়ানদের কুস্তির মত, তর্ক করিতে লাগিলেন। ইহাতে সত্য-নির্ণয় না হইয়া, কেবল তর্কশক্তির পরীক্ষা মাত্র হইত। তামাসা দেখিবার জন্য রাজা ও জনসাধারণ ইহা অনুমোদন করিতেন। তার্কিক কোলাহল, সারা জীবন এই ব্যবসা করিয়া, কত নির্দোষ ব্রাহ্মণকে মর্মপীড়া দিয়াছেন। আজ কিন্তু তিনি প্রমাদ গণিলেন। এই দ্বাদশবর্ষীয় বালকের মতগুলি শুনিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি নিজে জীবিত থাকিতে তাঁহার মাতাকে কিরূপে বন্ধ্যা বলিয়া প্রমাণ করিবেন! রাজসভায় বসিয়া, রাজা ও রানীর সম্মুখে, রাজাকে পাপী ও রানীকে অসতী বলা বিষম বিপজ্জনক! আবার, বালকের মত মানিয়া লইলেও পরাজয়। পন্ডিতের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, গলা শুকাইয়া গেল, চোখের সম্মুখে পৃথিবী যেন ঘুরিতে লাগিল। তিনি কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ঘামিতে লাগিলেন।

পন্ডিতের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শত্রুমিত্র উভয় পক্ষ কোলাহল আরম্ভ করিলে, বালক দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, "আপনারা সকলে দেখিতেছেন, কোলাহল শর্মা আমার মত মানিয়া লইলেন, ইহার বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে

পারিলেন না। তিনি শাস্ত্র পড়েন নাই, কেবল কূট বুদ্ধির কৌশলে, প্রকৃত পণ্ডিতগণকে নিরুত্তর করিয়া, অপমানিত করিয়াছেন। আমার মত তিনটি যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা, আমি নিজেই, শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করিতেছি।

১ম—আপনারা জানেন, পণ্ডিত কোলাহল শর্মা তাঁহার মাতার একমাত্র সন্তান। শাস্ত্র বলেন, এক পুত্রের মাতা বন্ধ্যা।

২য়—শাস্ত্রমতে, রাজা, প্রজার পাপ-পুণ্যের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কলিযুগে অধিকাংশ প্রজাই পাপী। সুতরাং রাজা নিষ্পাপ হইতে পারেন না।

৩য়—রাজার দেহে আটজন 'লোকপাল' দেবতা বাস করেন। এই কথা কে না জানে? সুতরাং কোনও রাজমহিষীকেই, বিচার-দৃষ্টিতে, সতী বলা যায় না।

বালক যামুন, তাহার মত সমর্থনের জন্য, নানা শাস্ত্র হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সকলকে আশ্চর্যান্বিত করিল। পণ্ডিত, পরাজয় স্বীকার করিয়া, সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। রাজা নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য, যামুনকে অর্ধ রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেন।

যামুন দ্বাদশবর্ষীয় বালক হইলেও রাজ্যলাভ করিয়া অতি দক্ষতার সহিত রাজ্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যৌবনেই সংসারের অসারতা বুঝিতে পারিয়া, তিনি সংসার ত্যাগ করেন এবং সাধারণ বৈরাগীদের ন্যায় ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ ও শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে মুগ্ধ বৈষ্ণবসমাজ তাঁহাকে নেতৃত্বে বরণ করিলেন। তাঁহার বহু শিষ্য হইল ; তাঁহাদের মধ্যে কাঞ্চীপূর্ণ, মহাপূর্ণ, শৈলপূর্ণ, মালাধর, তিরুবরাঙ্গ এবং বররঙ্গ প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

(২)

রামানুজ ও বৈষ্ণবসমাজ

বৈষ্ণবগণ রামানুজের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিতেন। রামানুজ শৈল-পূর্ণের ভাগিনেয়, বাল্যকাল হইতে কাঞ্চীপূর্ণের অনুগত এবং সর্বতোভাবে বৈষ্ণবভাবাপন্ন ; আবার, অসামান্য প্রতিভা-সম্পন্ন। এমন লোককে কোন্

সম্প্রদায় না আকাঙ্ক্ষা করে? কিন্তু তিনি যাদবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করাতে, বৈষ্ণবগণ হতাশ হইলেন।

একবার, যামুন মুনি, শ্রীবরদরাজ দর্শনে, কাঞ্চীপুরে গিয়াছিলেন। তথায় যাদবের সঙ্গে রামানুজকে দেখিয়া, তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইনি বৈষ্ণবসমাজে নেতৃত্ব করিবার জন্য জন্মিয়াছেন। প্রচণ্ড তার্কিক যাদবের নিকট হইতে রামানুজকে আকর্ষণ করিয়া আনিবার চেষ্টা করিলে, শৈবদের সঙ্গে বিবাদ হইতে পারে। তাই ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া অপেক্ষা করাই মুনি ভাল মনে করিলেন।

মাতুলের গুরু সিদ্ধ-মহাপুরুষ যামুন মুনির বিষয় রামানুজ ভাল রূপেই জানিতেন। কিন্তু শাস্ত্রপাঠের আগ্রহ হেতু, সময় করিয়া, তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতে পারেন নাই। এখন, যাদবের সহিত মতান্তর হওয়াতে, তিনি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন এবং কাঞ্চীপূর্ণের উপদেশ অনুসারে সাধন-ভজন করিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া বৈষ্ণবগণ উৎফুল্ল হইলেন।

বৃদ্ধ যামুন মুনি ভাবিয়াছিলেন, একদিন না একদিন রামানুজ তাঁহার নিকটে আসিবেই। কিন্তু সহসা তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। বৈষ্ণব সম্প্রদায় রক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় বলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া, তিনি, রামানুজকে কাঞ্চীপুর হইতে শ্রীরঙ্গমে লইয়া আসিতে, শিষ্য মহাপূর্ণকে পাঠাইলেন। শ্রীবরদরাজের মন্দিরে, তাঁহার সহিত রামানুজের সাক্ষাৎ হইল। মুনি অসুস্থ এবং তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, এই সংবাদ পাওয়া মাত্র রামানুজ মহাপূর্ণের সঙ্গে শ্রীরঙ্গম যাত্রা করিলেন; বাড়িতে এই সংবাদ দিতে গেলে যেটুকু সময় লাগে, তাহাও নষ্ট করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। এত ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়াও শ্রীরঙ্গমে পৌঁছিয়া তাঁহারা দেখিলেন, মুনি শরীর ত্যাগ করিয়াছেন; সৎকারের জন্য তাঁহার দেহ কাবেরী তীরে আনা হইয়াছে। এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহারা শোকে অভিভূত হইলেন।

রামানুজ দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে অধীর হইয়া শ্রীরঙ্গমের অধিষ্ঠাতা শ্রীরঙ্গনাথকে দর্শন না করিয়াই, তৎক্ষণাৎ কাঞ্চী যাত্রা করিলেন। সেইদিন শ্রীরঙ্গমের প্রায় সকল বৈষ্ণবই কাবেরী তীরে সমবেত হইয়াছিলেন। রামানুজের আকৃতি, প্রকৃতি ও কথাবার্তা, অল্প সময় লক্ষ্য করিয়াই সকলে বুঝিতে পারিলেন, এই ব্যক্তিই যামুনাচার্যের আসনে বসিবার উপযুক্ত।

(৩)

কাঞ্চীপূর্ণ সঙ্গে

পাণ্ডিত্যলাভের নেশায় হীনবুদ্ধি যাদবের সেবা করিয়া বৃথা আয়ুক্ষয় হইয়াছে, যামুন মুনির ন্যায় মহাপুরুষের সেবা করিলে জ্ঞানভক্তি লাভ হইত, এইরূপ চিন্তা করিয়া অনুশোচনায় রামানুজের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। শান্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হইলেন। তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে গুরু বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু কাঞ্চীপূর্ণ, শূদ্র ছিলেন বলিয়া, রামানুজকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বৈষ্ণবগণ বলেন, ভক্তের উচ্ছিষ্ট খাইলে ভক্তি হয়। তাই রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের ভুক্তাবশিষ্ট খাইয়া ভক্তিলাভ করিবার জন্য, একদিন তাঁহাকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন।

পত্নী জমাম্বা, রামানুজের আদেশে, মহাপুরুষের জন্য নানা প্রকার ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিলেন। রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণকে লইয়া আসিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; রামানুজ বাড়ি হইতে চলিয়া যাওয়া মাত্রই তিনি আসিয়া খুব ব্যস্ত ভাবে জমাম্বাকে বলিলেন, "মা, তুমি যাহা রাঁধিয়াছ, আমাকে তাহাই দাও, আমাকে এখনই মন্দিরে গিয়া ঠাকুরের সেবা করিতে হইবে। বিলম্ব হইলে আমার খাওয়া হইবে না।" জমাম্বা তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া, বাধ্য হইয়া, তাড়াতাড়ি পরিবেশন করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ, যত শীঘ্র সম্ভব খাইয়া, এঁটোপাত ফেলিয়া এবং স্থান পরিষ্কার করিয়া, চলিয়া গেলেন। শূদ্রকে খাদ্যের অগ্রভাগ দেওয়া হইয়াছে, তাই পাকশালার সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন ফেলিয়া দিতে হইল। রান্নাঘর ধুইয়া, স্নান করিয়া, জমাম্বা আবার স্বামীর জন্য রাঁধিতে বসিলেন।

মন্দিরে বা অন্য কোনও স্থানে কাঞ্চীপূর্ণকে দেখিতে না পাইয়া, রামানুজ গৃহে ফিরিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ যে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়াই এরূপ ব্যস্ততা দেখাইয়া ভাল করিয়া আহার করেন নাই, তাহা বুঝিতে পারিয়া রামানুজ খুবই দুঃখিত হইলেন। জমাম্বা এত বড় মহাপুরুষকে শূদ্র জ্ঞান করিতেছেন দেখিয়া, তিনি আরও মর্মাহত হইলেন। কিন্তু দোষ কাহারও ছিল না।

সমাজের নিয়ম তিল মাত্র ভঙ্গ করা তখন ঐ অঞ্চলে মহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত।

ঐ অঞ্চলে তখন শূদ্রের ছায়া মাড়াইলেই মহাপাপ হইত। এই অবস্থায় শূদ্রের উচ্ছিষ্ট খাওয়া অতি সাহসের কাজ। ইহাতে বুঝা যায়, ভগবান্ লাভের জন্য রামানুজ কত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। দীক্ষা ব্যতীত সাধনা পূর্ণ হয় না। তাই, যামুনাচার্যের শিষ্য, ব্রাহ্মণ মহাপূর্ণের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে, কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। অবিলম্বে, দীক্ষিত হইবার জন্য, তিনি শ্রীরঙ্গম যাত্রা করিলেন।

(৪)
দীক্ষা

যামুনাচার্যের দেহত্যাগের পর, তিরুবরাঙ্গ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের অধ্যক্ষ হইলেন। আচার্যের শিষ্যগণের মধ্যে অনেক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের সঙ্গে শাস্ত্রবিচার করিয়া বৈষ্ণব মত রক্ষা করিবার মতো পাণ্ডিত্য ও তেজস্বিতা কাহারও ছিল না। আচার্যদেব রামানুজকে বৈষ্ণব সমাজের নেতা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবগণও বুঝিয়াছিলেন, যামুনাচার্যের আসনে বসিবার উপযুক্ত ব্যক্তি একমাত্র রামানুজ। তাই, তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া, রামানুজকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিবার জন্য, পণ্ডিত মহাপূর্ণকে কাঞ্চী যাইতে অনুরোধ করিলেন। বেশিদিন থাকিবার প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া, মহাপূর্ণ স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, কাঞ্চী যাত্রা করিলেন। অপর দিক হইতে, দীক্ষা লইবার জন্য, রামানুজও শ্রীরঙ্গমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মধ্যপথে উভয়ে মিলিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের উদ্দেশ্য জানিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। রামানুজের মনে যখন যে সংকল্প উঠিত, তাহা কার্যে পরিণত করিতে তাঁহার বিলম্ব সহিত না। তিনি, সেই স্থানেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণবসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইলেন।

রামানুজ গুরুকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া নিজ গৃহে স্থান দিলেন। তাঁহার পত্নীও মহাপূর্ণের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। বৈষ্ণবধর্মের অনেক গ্রন্থ তামিল ভাষায় রচিত। রামানুজ গুরুর নিকট সেই সব পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন।

(৫)

জমাম্বা

ভগবানের ধ্যান-চিন্তায় এবং মহাপূর্ণ ও কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গে হরি-কথায়, রামানুজের দিন আনন্দে কাটিতে লাগিল। কিন্তু সংসারের কাজে তাঁহার অমনোযোগ দেখিয়া, জমাম্বা বিরক্ত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিল। রামানুজ অতিথি ও দরিদ্রদিগকে খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। জমাম্বা অভিমান করিয়া এই কাজে অবহেলা ও বিরক্তি দেখাইতে লাগিলেন। দিন দিন স্বামী-স্ত্রীর মতান্তর বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন সকালবেলা রামানুজ দেখিলেন, একটি লোক উপবাসে বড় কষ্ট পাইতেছে। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, লোকটিকে খাইতে দিবার মতো কোনও কিছু ঘরে নাই। কিন্তু তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। জমাম্বা অন্য কাজে সরিয়া গেলে, রামানুজ সন্ধান করিয়া দেখিলেন, রান্না ঘরে প্রচুর বাসি ভাত রহিয়াছে। ইহাতে রামানুজ বড়ই ব্যথিত হইলেন।

একদিন জমাম্বা ও গুরু মহাপূর্ণের স্ত্রী, এক সঙ্গে এক কুয়া হইতে জল তুলিতেছিলেন। গুরুপত্নীর কলসী হইতে দুই এক ফোঁটা জল জমাম্বার কলসীতে পড়িয়া গেল। ইহাতে জমাম্বা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে নানা কটু কথা বলিতে লাগিলেন।

মহাপূর্ণ পূর্ব হইতে জমাম্বার মতিগতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। এই ব্যাপার এইখানেই শেষ হইবে না এবং গুরু-শিষ্যের কলহ বড়ই লজ্জার বিষয়, এই ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সস্ত্রীক শ্রীরঙ্গম যাত্রা করিলেন। রামানুজ বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ি ফিরিয়া তিনি এই ঘটনা জানিতে পারিয়া বুঝিলেন, স্ত্রীকে নিয়া সংসার-ধর্ম পালন করা তাঁহার পক্ষে সুকঠিন। তাঁহার নিজের মনের যে অবস্থা, তাহাতে স্ত্রীকে নিয়া আমোদ করিয়া তাঁহাকে খুশি করা একান্ত অসম্ভব। ভগবানের কথা, ভগবানের চিন্তা ছাড়া অন্য কোনও বিষয় তাঁহার ভাল লাগে না ; এমন কি যাহারা ভগবানের চিন্তা করে না তাহাদের সঙ্গে থাকাও কণ্টকর মনে হয়। স্ত্রী যদি স্বামীর ধর্মের সহায় না হন, তবে স্বামীর পক্ষে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। আর যদি স্ত্রী স্বামীর বিরোধী হন, তবে উভয়ের এক সঙ্গে বাস উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গলজনক।

রামানুজ স্ত্রীকে তাঁহার সাধন-পথে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু জমাম্বার মন কিছুতেই ফিরিল না। তখন আর কোন উপায় নাই দেখিয়া, তিনি স্ত্রীকে শ্বশুর-বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন।

বুদ্ধদেব, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেও, তাঁহাদের পত্নীগণ স্বামীর ধর্ম গ্রহণ করিয়া, অতি মহৎ জীবন যাপন করেন। তাঁহারা, স্বামীর ভক্তসম্প্রদায়ে, এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জমাম্বা সম্বন্ধে আমরা আর কিছুই জানি না।

(৬)
সন্ন্যাস

রামানুজের সংসারের একমাত্র বন্ধন খসিয়া পড়িল। হিন্দুধর্মে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটি আশ্রম বা সাধন-পথ আছে। প্রত্যেক হিন্দুকে ইহার মধ্যে কোনও একটি আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হয়। স্ত্রী ছাড়া গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকা যায় না। সেই জন্য রামানুজ এখন সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। তিনি, নিজ গ্রাম পেরেমবুদুরে যাইয়া, সমুদয় বিষয়-সম্পত্তি আত্মীয়গণকে দান করিলেন এবং আদি-কেশবের মন্দিরে, ঠাকুরের সম্মুখে, কৌপীন, গৈরিক বস্ত্র, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন।

রামানুজ, মহৎ চরিত্র ও প্রতিভা হেতু, কাঞ্চীপুরে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করায় নগরের সর্বত্র এই বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল। তিনি শ্রীবরদরাজের সেবা, সাধন-ভজন ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া নগরে একটি প্রবল ধর্ম আন্দোলন উত্থাপন করিলেন। নগরের সকল শ্রেণীর লোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। তাঁহার ভাগিনেয় পণ্ডিত দাশরথি এবং কুর-অগ্রহারের বিখ্যাত দাতা ও শ্রুতিধর পণ্ডিত কুরেশ প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণব সমাজ পরম উৎসাহে তাঁহাকে নেতৃপদে বরণ করিলেন।

(৭)

যাদবের পরিণাম

দেশের লোক রামানুজকে নিয়া মাতিয়া উঠিলে, যাদবের অবস্থা শোচনীয় হইল। যে যাদব কাঞ্চী নগরে রাজার মতো সম্মানিত ছিলেন, আজ রামানুজের তেজে তিনি ম্লান দিবা-প্রদীপের ন্যায় নিস্তেজ। ঈর্ষা, পূর্বপাপের অনুশোচনা, পরকালের ভয় ইত্যাদি নানা মর্মপীড়ায় তিনি দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

যাদবের বৃদ্ধা মাতা তখনও জীবিত ছিলেন। বরদরাজের মন্দিরে রামানুজের জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখিয়া বৃদ্ধার বোধ হইল, যেন সাক্ষাৎ ভগবান সম্মুখে উপস্থিত। পুত্রের পূর্ব চরিত্র ও বর্তমান মানসিক অশান্তি মাতার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি ঘরে ফিরিয়াই নিজ অনুভবের কথা পুত্রকে বলিতে লাগিলেন এবং "কথার ধর্ম" ও ভণ্ডামি ছাড়িয়া এই মহাপুরুষের আশ্রয় নিতে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন।

যাদব দুশ্চিন্তায় পাগলের মতো হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি ভাবিলেন, তীর্থযাত্রা উপলক্ষ করিয়া কাঞ্চী হইতে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু এত কাল এক স্থানে শারীরিক আরামে থাকায়, এখন বৃদ্ধ বয়সে দেশে দেশে পরিব্রাজক হইয়া বেড়াইবার, কিংবা কষ্ট করিয়া দূর তীর্থে বাস করিবার সাহস তাঁহার আর নাই। আবার কাঞ্চীতে, অজ্ঞাত অখ্যাত হইয়া এক কোণে পড়িয়া থাকিয়া, লোককে মুখ দেখানোও অসম্ভব।

স্নেহময়ী মাতা প্রতিদিন, বার বার, বলিতে লাগিলেন, এই মহাপুরুষের আশ্রয় নিলেই যাদব শান্তি পাইবেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ লোকের পক্ষে, নিজের একটি যুবক শিষ্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ একান্তই অসম্ভব।

যাদব প্রথম জীবনে, মুক্তি লাভের জন্য সর্বত্যাগের সংকল্প করিয়াছিলেন। জ্ঞান লাভের জন্য শাস্ত্র পড়িতে যাইয়া, তুচ্ছ মান যশের মোহে, আজ তাঁহার এই দুর্দশা। ভগবান্ লাভ করিলে, নিজ অন্তরে ব্রহ্মানুভব হইলে, মানুষ অনন্ত আনন্দের অধিকারী হয় এবং দেবতারও পূজ্য হয়,—এই সব কথা বৎসরের পর বৎসর, শত সহস্র বার আলোচনা করিলেও, কি এক দৈবশক্তিবশে মুগ্ধ হইয়া, তিনি সেই অবস্থা লাভের চেষ্টা করেন নাই। আজ তিনি নিঃস্ব, নিরুপায়। এই বয়সে জ্ঞান লাভের জন্য কঠোর সাধন ভজন করিবার সাহসও

তাঁহার আর নাই। অনুশোচনার বেদনায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, জীবন দুর্বিষহ বোধ হইতে লাগিল।

এই সময়ে ঘটনাক্রমে একদিন বরদরাজের মন্দিরে রামানুজের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রামানুজ পরম ভক্তি সহকারে পূর্বের ন্যায় যাদবকে গুরুবৎ সম্মান করিয়া বসাইলেন। উভয়ের মধ্যে কিছু শাস্ত্র আলোচনা হইল। শুষ্ক পণ্ডিত যাদব, রামানুজের বিনয়ে, মহত্ত্বে ও তেজে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কি এক দৈববলে, যেন, তাঁহার মন হইতে রামানুজের প্রতি অপ্রীতি ও অবজ্ঞার ভাব দূর হইয়া গেল এবং বর্তমান মনোবেদনার স্থলে শিষ্যের প্রতি পূর্ব স্নেহ প্রবল হইয়া সকল অশান্তি দূর করিল। ভগবানের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইয়া যায়।

এখন মধ্যে মধ্যে রামানুজের নিকট যাইয়া, তিনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন, ভগবান্ লাভ করিলে মানুষের জীবনে যে সব পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হয়, চরিত্রে যেরূপ মাধুর্য বিকাশের কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে, রামানুজের মধ্যে তাহার পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে। পরন্তু, অন্যকে ধর্ম অনুভব করাইবার যে ঐশ্বরিক শক্তি কেবল অবতার পুরুষেই বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও রামানুজের মধ্যে রহিয়াছে।

যাদব এতকাল কেবল, "কাঠে আছে আগুন, কাঠে আছে আগুন" বলিয়া অন্যকে উপদেশ দিয়াছেন ; নিজে সেই আগুন জ্বালিয়া, রাঁধিয়া খাইয়া যে তুষ্টি পুষ্টি হয়, তাহার চেষ্টা করেন নাই। এখন, রামানুজের মধ্যে সেই ব্রহ্মানন্দের স্ফুরণ দেখিতে পাইয়া তাঁহার পূর্বসংস্কার ফিরিয়া আসিল। এই ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ মান-অপমানের হিসাব করিয়া, এমন মহাপুরুষের সহায়তা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করা যে কত মূঢ়তা, শাস্ত্রজ্ঞ যাদব তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিলেন। জন্ম-জন্মার্জিত শুভ সংস্কার জয়ী হইল, সকল অভি-মান ত্যাগ করিয়া যাদব রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

এই সংবাদ অচিরে প্রচারিত হইয়া, দেশে এক বিপুল ধর্মান্দোলন উপস্থিত করিল। রামানুজের মধ্যে যে ভগবৎ-শক্তির বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে, লোকে তাহা বুঝিতে পারিল। তাঁহার যশোগানে দক্ষিণাপথ মুখরিত হইয়া উঠিল।

তৃতীয় অধ্যায়

(১)

শ্রীরঙ্গমে

আচার্য রামানুজের গৌরবে বৈষ্ণবসমাজ উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। সাধনহীন শৈব দলপতিগণ ভীত হইলেন। যামুন মুনির তপঃ-প্রভাবে, তখন শ্রীরঙ্গম ছিল বৈষ্ণবদের প্রধান কেন্দ্র। মুনির শিষ্যগণ, রামানুজকে শ্রীরঙ্গমে লইয়া আসিবার জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন। বররঙ্গ সুগায়ক ও সুবক্তা ছিলেন। ভগবানের স্তুতিগানে এবং মধুর প্ররোচনা-বাক্যে তুষ্ট করিয়া রামানুজকে আসিতে সম্মত করিতে পারিবেন ভাবিয়া, বৈষ্ণব নেতৃগণ তাঁহাকে কাঞ্চীপুরে প্রেরণ করিলেন। গুরু মহাপূর্ণ ও গুরুস্থানীয় অন্যান্য মহাপুরুষদের অভিপ্রায় জানিয়া, রামানুজ শ্রীরঙ্গমে চলিয়া গেলেন। বৈষ্ণবসমাজ তাঁহার হাতে শ্রীরঙ্গনাথের সেবা ও সমাজ-রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

বৈষ্ণবসমাজের উপর একাধিপত্য লাভ করিয়া, তিনি নিজের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইলেন। এই সমাজের আচার ও নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, তিনি যামুনাচার্যের শিষ্যদের নিকট, প্রাচীন মহাপুরুষদের রচিত শাস্ত্রাদি পাঠ ও সাধনা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

(২)

গোবিন্দের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ

রামানুজের মাসতুত ভাই গোবিন্দ অত্যন্ত সরল ছিলেন। তিনি যাদবের নিকট শাস্ত্র পাঠ করিতেন। কিন্তু অধ্যয়ন অপেক্ষা সাধন ভজনে তাঁহার অনুরাগ ছিল বেশি। যাদবের সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করিয়া আসিয়া, তিনি আর

পড়িলেন না ; শ্রীশৈলের নিকটবর্তী এক শৈবপ্রধান স্থানে, শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া, তাঁহার সেবায় মনপ্রাণ নিয়োজিত করিলেন।

রামানুজ শ্রীরঙ্গমে যাইয়া, ভাই গোবিন্দকে নিজ সম্প্রদায়ে আনিবার জন্য, মাতুল শৈলপূর্ণকে অনুরোধ করিয়া, এক পত্র লিখিলেন। শৈলপূর্ণ গোবিন্দের সাধনস্থান মঙ্গল গ্রামে যাইয়া এক সরোবর তীরে বটগাছের তলায় বসিয়া, সমাগত জনগণের নিকট বৈষ্ণবধর্ম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন পরে, গোবিন্দের দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি, অন্যান্য লোকের ন্যায়, শৈলপূর্ণের ধর্মকথা শুনিতে, মধ্যে মধ্যে বটতলায় যাইয়া বসিতে লাগিলেন এবং তর্ক-বিতর্কেও কিছু কিছু যোগ দিলেন। ক্রমে ক্রমে, শৈল-পূর্ণের অপূর্ব ব্যাখ্যান, মধুর ভাষা ও বিনীত ব্যবহারে গোবিন্দের মন টলিল। তিনি শৈলপূর্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইলেন। বলা বাহুল্য, এই সংবাদ পাইয়া রামানুজ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

(৩)

কুরেশ

কুরেশের নাম জানা যায় না। তিনি কুর গ্রামের অধিকারী ছিলেন বলিয়া, সকলে তাঁহাকে 'কুরেশ' বলিত। তাঁহার বাড়িতে ক্ষুধিত হইয়া যে-ই যাইত, সে-ই খাইতে পাইত। তাঁহার যাহা কিছু আয় ছিল, সবই তিনি ঐ কাজে ব্যয় করিতেন। সেইজন্য অন্নদাতা বলিয়া তাঁহার খুব খ্যাতি ছিল।

রামানুজ কাঞ্চী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, কুরেশের মনে এক নূতন ভাব উপস্থিত হইল। সমস্ত দিন দান-দক্ষিণা ও নিজের প্রশংসা শ্রবণ কার্যে ব্যস্ত থাকিলে, ভগবানকে ডাকিবার আর সময় থাকে না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহার নিকট, সংসার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। একদিন তিনি বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া ভিখারীর বেশে শ্রীরঙ্গমে গুরুর নিকট যাত্রা করিলেন।

স্বামী এইরূপ দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করাতে, কুরেশের পতিপরায়ণা স্ত্রী খুবই বিচলিত হইলেন এবং এই কঠিন পথে স্বামীকে একা ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না : তিনি নিজেও স্বামীর অনুগমন করিলেন। যদি কখনও খুব অভাবে পড়েন, তখন কাজে লাগিবে ভাবিয়া, তিনি গোপনে কিছু সোনা সঙ্গে লইলেন।

চলিতে চলিতে, তাঁহারা, একদিন এক বনপথে উপস্থিত হইলে কুরেশ-পত্নী অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তাহাতে কুরেশের মনে সন্দেহ হইল যে, পত্নীর সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনও মূল্যবান বস্তু রহিয়াছে। তাহা না হইলে ভয়ের কি কারণ থাকিতে পারে? যাহার নিকট অর্থ থাকে, সেই তো চোর-ডাকাত হইতে ভয় পায়। কুরেশের উপদেশে সোনা ফেলিয়া দেওয়াতে সত্য সত্যই তাঁহার মনে আর কোনও ভয় রহিল না।

কুরেশ ও তাঁহার পত্নী গুরুর নিকট যাইয়া, তাঁহারই অনুসরণে ভিক্ষান্নে জীবনধারণ ও সাধনভজনে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

(৪)

মহাপুরুষ

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্
অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাম্
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥ ভাগবত ৯।২১।১২

ঈশ্বরের কাছে নাহি অষ্ট সিদ্ধি করি আকিঞ্চন,
মুক্তি কিংবা অমরতা, তাতে মোর নাহি প্রয়োজন।
সবার অন্তরে পশি, দুঃখ সহি তাহাদের সনে,
'সবারে করিব সুখী' এই একমাত্র আশা মনে।

শ্রীরঙ্গমের নিকটবর্তী গোষ্ঠিপুর গ্রামে, যামুনাচার্যের শিষ্য গোষ্ঠিপূর্ণ বাস করিতেন। তিনি নারায়ণ মন্ত্রে সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সাধন গুণে মন্ত্রে এত শক্তি জাগ্রত হইয়াছিল যে, ইহা গুরুমুখে শ্রবণ মাত্র শিষ্য অন্তরে ঈশ্বরানুভূতি লাভ করিত। সম্পূর্ণ উপযুক্ত বোধ না করিলে, গোষ্ঠিপূর্ণ কাহাকেও এই মন্ত্র শুনাইতেন না। এই মন্ত্র লাভ করিবার জন্য, রামানুজ পরম ভক্তির সহিত গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট গিয়া প্রার্থনা জানাইলেন। 'পরে আসিও' বলিয়া তিনি রামানুজকে বিদায় দিলেন। রামানুজ আবার গেলে, আবার এইরূপ

বলিয়া নিরস্ত করিলেন। রামানুজ বার বার যাইতে লাগিলেন এবং গোষ্ঠি-পূর্ণও তাঁহাকে বার বার ফিরাইয়া দিলেন। ইহাতে রামানুজের মনে সন্দেহ হইল, অবশ্যই তাঁহার মনে কোনও রূপ মলিনতা আছে, তাই, গুরু তাঁহাকে মন্ত্র গ্রহণের যোগ্য মনে করিতেছেন না। এই ভাবিয়া, তিনি কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইলেন ; তাঁহার শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল ; প্রফুল্ল মুখে সকলের নিকট তাঁহার শাস্ত্রালোচনা বন্ধ হইল।

রামানুজের মতো উত্তম অধিকারীকে মন্ত্র না দেওয়াতে, গোষ্ঠিপূর্ণের বিরুদ্ধে নানারূপ সমালোচনা হইতে লাগিল। এমন কি, একদিন জনৈক বৈষ্ণব ক্রুদ্ধ হইয়া গোষ্ঠিপূর্ণকে দুই একটি কটু কথা বলিলেন। কিন্তু গোষ্ঠিপূর্ণ কিছুতেই বিচলিত হইলেন না এবং রামানুজও অধ্যবসায় ত্যাগ করিলেন না। অষ্টাদশ বার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তিনি আবার গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট যাইয়া প্রার্থনা জানাইলেন। এইবার তাঁহার মন গলিল, তিনি রামানুজকে মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং দৃঢ়ভাবে বলিয়া দিলেন, অনধিকারীকে এই মন্ত্র দিলে মন্ত্রদাতার ঘোর নরক হইবে।

রামানুজ মন্ত্র শ্রবণ মাত্র এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন। মন্ত্রের এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। দীক্ষা সম্বন্ধীয় সমুদয় কর্তব্য শেষ হইলে, গুরুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, তিনি শ্রীরঙ্গম যাত্রা করিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতে তাঁহার মনে কি এক ভাবের উদয় হইল, তিনি পথে যাহাকে পাইলেন তাহাকেই বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাদিগকে এক অমূল্য রত্ন দিব।" তাঁহাকে সকলে দেবতা জ্ঞান করিত ; তাঁহার এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল মধ্যে, নিকট-বর্তী গ্রামের সমস্ত লোক তথায় সমবেত হইল। দক্ষিণ ভারতে দেব-মন্দিরের ফটকের উপর খুব উচ্চ মঞ্চ থাকে। রামানুজ সেই গ্রামের এক ঠাকুরবাড়ির ফটকের উপর উঠিয়া, সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভাই-ভগিনীগণ, আমি তোমাদিগকে একটি মন্ত্র শুনাইব, আমার সঙ্গে ইহা তিন বার উচ্চারণ করিলে, তোমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে এবং দেহত্যাগের পর তোমরা বৈকুণ্ঠে যাইবে।" এই কথা বলিয়া, তিনি উচ্চৈঃস্বরে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রটি তিনবার উচ্চারণ করিলেন। সমবেত জনতাও তাঁহার সঙ্গে ইহা আবৃত্তি করিল। শব্দগুলি উচ্চারণ করিবা মাত্র, সকলে বোধ করিল, যেন

তাহাদের নিজ নিজ শরীরের বোঝাটি খসিয়া পড়িয়াছে এবং অপূর্ব আনন্দে মন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মানুষের নিজের ভিতর যে এত আনন্দ আছে, তাহা তো মানুষ জানে না। রামানুজকে সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা ভগবান্ জ্ঞান করিয়া, ব্রহ্মানন্দে ভরপুর হইয়া, সকলে ঘরে ফিরিল।

এদিকে, গোষ্ঠিপূর্ণ এই সংবাদ শুনিয়া, ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া, শিষ্যকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। ক্রোধ হইবারই কথা বটে! যাকে তাকে মন্ত্র দিতে এত নির্বন্ধ সহকারে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, আর, রামানুজ কি-না সদ্য সদ্য, একেবারে হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া, গুরুর আদেশ সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করিলেন! গুরুদেবের আহ্বান শুনিয়া রামানুজ তৎক্ষণাৎ অতি বিনীত-ভাবে, নিঃসঙ্কোচে, গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরু ক্রুদ্ধ হইয়া কতই-না ভর্ৎসনা করিলেন এবং দুষ্কার্যের ফলে তাঁহার যে নরক বাস হইবে, এই কথাও বার বার স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। রামানুজ প্রফুল্ল মুখে স্থির হইয়া সকল কথা শুনিলেন, তারপর অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব, এই সব লোক সংসার বন্ধনে পড়িয়া বড়ই কষ্ট পাইতে-ছিল। আজ এই মন্ত্র শ্রবণ করিয়া সকলে মুক্তিলাভ করিল। এত লোকের মুক্তির জন্য আমার একজনের নরক-বাস হউক, তাহাতে আমার কোনও দুঃখ নাই।" রামানুজের করুণা ও গুরু-বাক্যে বিশ্বাসের সহিত স্বাভাবিক তেজস্বিতা মিলিয়া, এমন এক সৌন্দর্যের প্রকাশ হইল যে, গোষ্ঠিপূর্ণের হৃদয় গলিয়া গেল, ক্রোধের স্থলে তাঁহার মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। তিনি রামানুজকে মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। পরার্থে সর্বত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত এই স্বার্থ-সর্বস্ব মানব জগতে বড়ই দুর্লভ। গুরু নিজ পুত্র সৌম্যকে রামানুজের শিষ্য করিয়া দিয়া, মহত্ত্বের পূজা করিলেন।

অতঃপর, রামানুজ খুব শ্রদ্ধার সহিত মালাধর ও বররঙ্গের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিলেন। তাঁহার প্রতিভা ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া ইঁহারাও রামানুজকে মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিলেন। মালাধর নিজ পুত্রকে এবং বররঙ্গ নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ইঁহার শিষ্য করিয়া দিলেন।

যামুন মুনির শিষ্যগণের সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া রামানুজের শিক্ষা পূর্ণ হইল।

দাশরথি

দাশরথি কুলীন ও মহাপণ্ডিত ; আর, সম্ভবতঃ আচার্যদেবের ভাগিনেয় বলিয়া একটু অভিমানী ছিলেন। তিনি 'গীতার শেষ কথা'* জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, আচার্য তাঁহাকে গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট পাঠাইলেন। তিনি গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট যাইয়া প্রায় ছয় মাস তাঁহার সেবা করিলেন।

একদিন গোষ্ঠিপূর্ণ তাঁহাকে বলিলেন যে, গুরুর নিকট হইতেই এই বিষয় তাঁহার শিক্ষা করা উচিত। দাশরথি ফিরিয়া আসিয়া আচার্যদেবকে ইহা জানাইলেন। এই সময় গুরু মহাপূর্ণের কন্যা অত্তুলা আসিয়া রামানুজকে বলিলেন যে, তাঁহার শ্বশুরবাড়িতে সংসারের সমুদয় কাজ তাঁহাকে একাকী করিতে হয়, কাজকর্মের ত্রুটি হইলে শাশুড়ী তাঁহাকে গালমন্দ করেন এবং বলেন, যদি বড়মানুষী করিতে হয়, তবে বাপের বাড়ি হইতে পাচক-ভৃত্য আনিতে হইবে। বালিকা বলিতে লাগিল, "বাবাকে আমি এই কথা বলিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, আমি কি করিতে পারি, মা, তুমি তোমার রামানুজ দাদাকে এই বিষয় জানাও।" অত্তুলার এই সব কথা শুনিয়া, আচার্যদেব দাশরথির দিকে তাকাইলেন। দাশরথি গুরুর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, পাচক রূপে অত্তুলার সঙ্গে তাঁহার শ্বশুরবাড়িতে চলিয়া গেলেন। অত্তুলার শ্বশুর শাশুড়ী ও অন্যান্য সকলে তাঁহাকে পাচক-জ্ঞানে অবজ্ঞা করিলেও, তিনি অভিমান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া, কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিলেন।

একদিন, এক ব্যক্তির সঙ্গে শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার একটা তর্ক উপস্থিত হয়। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া উপস্থিত সকলে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তখন তাঁহারা সন্ধান নিয়া জানিলেন, ইনি একজন সর্বত্যাগী মহাপুরুষ এবং আচার্যের ভাগিনেয়। এই কথা শুনিয়া অত্তুলার শ্বশুর

---

* গীতার শেষ কথা—সর্ব প্রকার ধর্মকর্ম ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ভগবানের চিন্তা করিলে সকল পাপ দূর হয় এবং মুক্তিলাভ হয়।

শাশুড়ী অত্যন্ত ভীত হইয়া দাশরথির পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন এবং আচার্যের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে পাচকের কাজ হইতে মুক্ত করিলেন।

দাশরথির সকল অভিমান দূর হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, আচার্যদেব তাঁহাকে এইবার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার চরম জ্ঞান উপদেশ করিয়া কৃতার্থ করিলেন।

(৬)

পূজারী

শ্রীরঙ্গমে আচার্য রামানুজ এখন সর্বেসর্বা। ঠাকুরসেবার দিকে তাঁহার দৃষ্টি তীক্ষ্ন, এক-তিল এদিক ওদিক হইবার উপায় নাই। সুতরাং পূজারী-গণকে সর্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত। প্রধান পূজারী-ঠাকুরের ক্ষমতা ও প্রভাব অনেকটা খর্ব হইয়া গেল। আচার্যগণ পুরাতন নিয়ম ষোল আনা মানিলেও, অনেক আচার ব্যবহার তাঁহারা নূতন ছাঁচে ঢালিয়া কালোপযোগী করিয়া নেন। বৃদ্ধ ও মূর্খেরা তাহা একেবারেই সহ্য করিতে পারে না। এই-সব নানা কারণে, মন্দিরের প্রধান পূজারী মনে-প্রাণে আচার্যদেবের মহা শত্রু হইয়া উঠিল। সে তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিবার জন্য ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিল।

আচার্য প্রত্যহ সাত বাড়িতে ভিক্ষা করিতেন। পূজারী একদিন ভিক্ষা দিবার ছলে, তাঁহাকে বিষ-মিশ্রিত অন্ন খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু রামানুজ ভিক্ষা নিতে আসিলে, পূজারীর ভক্তিমতী স্ত্রী কৌশলে তাঁহাকে এই কথা জানাইয়া দিল। রামানুজ ইহাতে বড়ই ব্যথিত হইলেন ; তিনি ভাবিলেন, অবশ্যই তাঁহার কোনও দোষ আছে, নতুবা ঠাকুরের সেবকের মনে তাঁহার প্রতি এইরূপ হিংসার ভাব উপস্থিত হইবে কেন? তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ-মনে কাবেরী-তীরে যাইয়া অনাহারে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

আমরা নিজের দোষ-ত্রুটি কিছুতেই দেখিতে চাই না, সর্বদা পরকেই দোষী মনে করি। কিন্তু মহাপুরুষগণ পরের দোষ না দেখিয়া, নিজেকে সর্বদা দোষী দেখিতে চেষ্টা করেন।

মঠে ফিরিতে আচার্যের বিলম্ব দেখিয়া, খুঁজিতে খুঁজিতে শিষ্যগণ

কাবেরীতটে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। গোষ্ঠিপূর্ণও এই সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। গুরুকে দেখিয়া রামানুজ নদী-তীরে তপ্ত বালুকার উপর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া পড়িয়া রহিলেন। গোষ্ঠিপূর্ণ সেই দিকে মনোযোগ না দিয়া রামানুজের বিলম্বের কারণ ইত্যাদি সব কথা অন্য-দের নিকট হইতে শুনিতে লাগিলেন। আচার্যদেব তপ্ত বালুকার উপর পড়িয়া কষ্ট পাইতেছেন, অথচ গোষ্ঠিপূর্ণ তাঁহাকে উঠিতে আদেশ করিতেছেন না দেখিয়া, প্রণতার্তিহর নামক আচার্যের জনৈক শিষ্য বলিয়া উঠিলেন, "আপনি কি এই গরম বালিতে ফেলিয়া ইঁহাকে মারিয়া ফেলিতে চান?" প্রণতার্তিহর কথাটা কর্কশ ভাবেই বলিলেন ; গোষ্ঠিপূর্ণ কিন্তু রামানুজের গুরু-ভক্তি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি রামানুজকে সস্নেহে উঠাইয়া বলিলেন, "তুমি আর ভিক্ষায় বাহির হইও না ; তোমার এই শিষ্যটি তোমার জন্য রন্ধন করিবে। এ সত্য সত্যই তোমায় ভালবাসে।"

পূজারী যখন দেখিল তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, তখন সে অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। একদিন আচার্যদেব সন্ধ্যারতির পর চরণামৃত গ্রহণ করিতে গেলেন। পূজারী পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল ; সে এই সুযোগে, চরণামৃত দিবার ছলে, তাঁহাকে ভয়ানক কালকূট বিষ-মিশ্রিত জল দিল। আচার্যদেব ভক্তি সহকারে, সরল মনে, তাহা পান করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই বিষের ক্রিয়া দেখা গেল। আচার্য হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন এই সংবাদে নগরবাসিগণ উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল। তাঁহার যথোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল এবং তাঁহাকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য সারা-রাত্র ধরিয়া ভগবানের নাম-কীর্তন চলিল। পরদিন সকালে তিনি প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

পূজারীর দুষ্কার্যের কথা আর গোপন রহিল না। এখন ঘর হইতে বাহির হওয়া তাহার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবগণ সকল বিষয়ে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন ; তাহা না হইলে, পূজারীর জীবন রক্ষা করা কঠিন হইত। পূজারী যখন দেখিল, এমন ভয়ানক বিষ খাইয়াও আচার্য বাঁচিয়া রহিলেন, তখন সে পাপের আশঙ্কায় ও মানুষের নির্যাতনের ভয়ে, পাগলের ন্যায় আসিয়া আচার্যের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। দয়ার অবতার আচার্যদেব, "আর এরূপ করিও না" বলিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

যজ্ঞমূর্তি

ধর্ম সংস্কারের জন্য, মহাপুরুষগণ যে সব উপায় অবলম্বন করেন, বিষয়াসক্ত লোক, তাঁহাদের অনুকরণে, সেই সব কার্যের ভান করিয়া সাংসারিক উদ্দেশ্য সাধন করে ; চিরকালই এইরূপ দেখা যাইতেছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য অসৎপথগামী লোককে ধর্মপথে আনিবার জন্য, শাস্ত্রবিচার সহায়ে সনাতন ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে মান-যশ লাভের জন্য, পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিরা সন্ন্যাসী সাজিয়া, দিগ্‌বিজয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহারা কেহ কেহ অনেক শিষ্য ও পুস্তক সঙ্গে লইয়া, দেশে দেশে যাইয়া, পণ্ডিতগণকে তর্ক করিতে আহ্বান করিতেন এবং তর্কশাস্ত্রের রীতি অনুসারে কথার ফাঁক বাহির করিয়া একে অন্যকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেন। ইহাতে না থাকিত ভগবানের কথা, না ছিল সত্য নির্ণয়ের আকাঙ্ক্ষা। **চরিত্রের পবিত্রতা ও কঠোর সাধনা দ্বারা আত্মোপলব্ধি বা ভগবান্‌লাভই যে সন্ন্যাসের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল।**

সেই কালে যজ্ঞমূর্তি নামক জনৈক সন্ন্যাসী, পূর্বোক্ত-রূপ তর্কযুদ্ধ করিতে শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, তিনি মহা পণ্ডিত ও তার্কিক ছিলেন। তিনি আচার্যকে তর্ক প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন। কয়েক দিন ধরিয়া ধর্মশাস্ত্র নিয়া উভয়ে তুমুল তর্কযুদ্ধে রত হন। অবশেষে, তার্কিকের কূট কৌশলে, রামানুজ প্রায় নিরুত্তর হইলেন।

ভগবান্ লাভ হইলে মানব-স্বভাবের সর্ব-প্রকার দুর্বলতা দূর হইয়া যায় এবং জীবন আনন্দময় হইয়া উঠে। আর শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষের মনে অহঙ্কার ও ঈর্ষাদ্বেষ বৃদ্ধি হয়। তাহার ফলে, মানুষ নিজকে বড় দুর্বল, অসহায় ও নিরানন্দ বোধ করে। রামানুজ ভগবান্‌কে পাইয়াছেন—যাঁহাকে শাস্ত্রজ্ঞানে বা তর্ক-যুক্তি দ্বারা পাওয়া যায় না। তাই, যজ্ঞমূর্তি নানাপ্রকার বাক্যাড়ম্বর ও তর্ক-ঘটা প্রকাশ করিলেও আচার্যের বিরাট ব্যক্তিত্বের তুলনায় তাহা যে কত তুচ্ছ, এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান যে কত অল্প, তাহা তিনি পদে পদে সুস্পষ্ট রূপেই অনুভব করিলেন।

অবশেষে, অনুভব-হীন শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তি-তর্ক, প্রত্যক্ষ অনুভবে বলীয়ান সিদ্ধান্তের নিকট, নীরব হইতে বাধ্য হইল। আচার্যদেব কৃপা করিয়া, পণ্ডিতের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমান দূর হইল ; জ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার নাম হইল দেবরাজ মুনি।

(৮)

গোবিন্দের মহত্ত্ব

এই সময়ে, আচার্যদেব কিছুকাল নির্জনে তপস্যা করিবার জন্য মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট গিয়া বাস করেন। তাঁহার মাসতুত ভাই গোবিন্দ শৈলপূর্ণের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরু-সেবা জ্ঞান-লাভের প্রধান উপায় জানিয়া, তিনি, দিবানিশি, নিরলস ভাবে, গুরুর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন।

একদিন রামানুজ দেখিলেন, গুরুর বিছানা পাতিয়া গোবিন্দ তাহাতে গড়াগড়ি দিতেছেন। গুরুর বিছানায় ও আসনে শোয়া বা বসা মহাপাপ। এমন অন্যায় কাজ কেন করেন জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি উত্তর দিলেন, "ইহা মহাপাপ আমি জানি, কিন্তু বিছানা কোথাও কুচকান বা অসমান থাকিলে গুরুর কষ্ট হইতে পারে ; তাই, আমি নিজে বিছানা পরীক্ষা করিয়া দেখি। গুরুর সুখের জন্য, আমি পাপের ফলভোগ করিতে প্রস্তুত।" গুরুর প্রতি তাঁহার এত ভালবাসা দেখিয়া রামানুজ অত্যন্ত সুখী হইলেন।

আর একদিন, রামানুজ দেখিলেন, গোবিন্দ একটি প্রকাণ্ড সাপের মুখে হাত দিয়া কি করিতেছেন। কৌতূহলী হইয়া রামানুজ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "সাপটা মুখে কাঁটা ফুটিয়া ভারী কষ্ট পাইতেছিল, কাঁটাটা তুলিয়া দিলাম।" যেন সাপটা তাঁহার কত বন্ধু! যোগীরা বলেন, যোগ-সাধনা দ্বারা কাহারও মন হইতে হিংসা একেবারে চলিয়া গেলে, তাঁহার নিকটে, হিংস্র জন্তুর মনেও হিংসার ভাব উঠিতে পারে না। গোবিন্দের অপূর্ব চরিত্রের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া আচার্যদেব, শৈলপূর্ণের নিকট চাহিয়া, তাঁহাকে শ্রীরঙ্গমে লইয়া গেলেন।

শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আচার্যদেব অনেক গ্রন্থ রচনা করিলেন। তিনি নিজে নিজের মত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাই আমরা বিশুদ্ধ 'রামানুজ মত' এখনও জানিতে পারি। তাহা না হইলে, লোকে নানা প্রকার কুসংস্কার জড়াইয়া, তাঁহার মত বিকৃত করিয়া ফেলিত।

চতুর্থ অধ্যায়

(১)

ধর্ম সংস্থাপন

সাধনা, গ্রন্থ-রচনা ও প্রচার, এই তিনটি প্রধান উপায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান রক্ষা করা হয়।

১। সাধনা,—সাধনা না করিলে কোন প্রকার জ্ঞানই লাভ করা যায় না। যেমন, অঙ্ক শিখিতে হইলে, উহা শিখিবার যে নির্দিষ্ট প্রণালী আছে তাহা দীর্ঘকাল অভ্যাস করিতে হয়। সকল প্রকার জ্ঞান লাভের পদ্ধতিই এইরূপ। যে জ্ঞান যত গভীর, তাহার সাধনাও তত কঠোর। বিজ্ঞান সমূহে আবিষ্কৃত সত্যগুলি কত প্রাণপাতী সাধনার ফল। সাধনা করিয়া প্রত্যক্ষ না করিলে, কোনও জ্ঞানই কাজে লাগে না, কথার কথা মাত্র হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ফল আমরা নিত্য দেখিতেছি বলিয়া, বিজ্ঞানকে আমরা এত ভালবাসি এবং বিশ্বাস করি।

ধর্মও একটি বিজ্ঞান। তাহার নির্দিষ্ট সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করিলে নিশ্চিত রূপে জানিতে পারা যায় যে, (১) দেহ মানুষের বহিরাবরণ মাত্র, মৃত্যু কালে তাহা খসিয়া পড়ে এবং মানুষটি যেমন ছিল তেমনই থাকে ; (২) মানুষ পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সব কাজ করে, পর জন্মে তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য, বার বার জন্ম গ্রহণ করে ; (৩) তাহার সুখ ও দুঃখের কারণ পূর্বকৃত সৎ ও অসৎ কর্ম ; (৪) ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হইলে মানুষের সকল প্রকার অজ্ঞান, দুর্বলতা ও অপূর্ণতা চলিয়া যায়, ইত্যাদি।

এই সকল সত্য প্রত্যক্ষ অনুভব করিলে, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অসদুপায়ে স্বার্থ-সাধনের কিছুমাত্র প্রয়োজন তো থাকেই না, পরন্তু মানুষ জিতেন্দ্রিয় ও পরার্থপর হইয়া থাকে। বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ নিজে সাধন করিয়া এই সব সত্য প্রত্যক্ষ অনুভব করেন এবং তাঁহাদের শিষ্যদিগকে অনুভব করাইয়া দেন। তাহার ফলে, তাঁহাদের পরবর্তী ভারতীয় সমাজ প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে।

অপর পক্ষে, যখন যে মানব-সমাজ ধর্ম-বিজ্ঞান সাধনা পরিত্যাগ করে, সেই সমাজের লোক পরকালে বিশ্বাস হারায় এবং লোভ-মোহের বশে পাপ-পুণ্যের বিচার করিতে অসমর্থ হইয়া পশুতুল্য হিংস্র হইয়া উঠে। ইহার প্রমাণ বর্তমান জগতে সর্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে।

সাধনাই সর্বপ্রকার জ্ঞান রক্ষার প্রধান উপায়।

২। গ্রন্থ রচনা,—জ্ঞানী নিজের অনুভূত সত্য নিজে লিখিয়া রাখিলে, মূর্খের কুসংস্কার তাহাতে মিশিতে পারে না এবং প্রবঞ্চকগণ জ্ঞানীর নামে করিয়া নিজের অসদভিসন্ধিপূর্ণ মত অন্ততঃ শিক্ষিত লোকের নিকট প্রচার করিতে সাহস করে না।

প্রচারের অর্থাৎ অন্যকে শিখাইবার ব্যবস্থা না থাকিলে, সকল প্রকার জ্ঞানই কালে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া জ্ঞান রক্ষার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আর, জ্ঞান সর্বত্র প্রচার করিলে, বহু লোকের বিচার বিতর্ক ও সমালোচনার ফলে তাহাতে কুসংস্কার প্রবেশ করিতে পারে না। বহু দেশে, বহু স্থলে, যে বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহা সহজে নষ্ট হয় না।

অতি প্রাচীনকাল হইতে, জ্ঞানিগণ, এই তিন উপায়ে সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আচার্যদেব এই তিনটি উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ আচার্যদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ, কঠোর সাধনা করিয়া, মন হইতে হিংসা-দ্বেষ, অভিমান-অহঙ্কার এবং কাম ক্রোধ প্রভৃতি মলিনতা দূর করিলেন। তাঁহাদের মহত্ত্ব, তেজস্বিতা, মধুর চরিত্র ও অসামান্য মানসিক শক্তি দেখিয়া, তাঁহাদিগকে আদর্শ মানুষ বলিয়া সকলেই ভক্তি করিতে লাগিল এবং তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া সুখী হইল।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি নিজে, নিজ অনুভূত সত্য বুঝাইবার জন্য, অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার শিষ্যগণও এই মত রক্ষার জন্য, অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, এই জ্ঞান রক্ষার জন্য, তিনি বিশ্ববিদ্যালয় স্বরূপ একটি সাধক-সম্প্রদায় গঠন করেন। মঠ-আশ্রমে এবং শ্রীরঙ্গম ও কাঞ্চী প্রভৃতি দেব-স্থানে, শাস্ত্র আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া, আচার্যদেব যে প্রচার কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়া যান, তাহা সহস্র বৎসর যাবৎ এখনও অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

নিজে সর্বত্র যাইয়া, তর্ক বিচার ও ব্যাখ্যা করিয়া, নিজের মত স্থাপন করিলে, শীঘ্রই তাহা ছড়াইয়া পড়ে। সেই জন্য আচার্য শংকরের ন্যায়, আচার্য রামানুজও ব্যাপক ভাবে ভারতের সর্বত্র স্বীয় মত প্রচার করা কর্তব্য মনে করিয়াছিলেন।

(২)

দিগ্‌বিজয়

আচার্যদেব শ্রুতিধর কুরেশ ও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ দাশরথি প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্যগণকে সংগে লইয়া ধর্ম প্রচারে বাহির হইলেন। তিনি প্রথমে শ্রীরংগমে রংগনাথকে, কাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজকে এবং পেরেমবুদুরে আদি-কেশবকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন ; অতঃপর, দক্ষিণ দিকে রামেশ্বর পর্যন্ত সর্বত্র, পন্ডিতদের সংগে শাস্ত্রবিচার করিয়া, তাঁহাদিগকে নিজ মত লওয়াইলেন এবং সর্বসাধারণকে ভক্তি দানে কৃতার্থ করিলেন।

ঐ দিকের ব্রাহ্মণগণ তখন বিষম গোঁড়া। দক্ষিণে কোন কোন জাতির লোকের মুখ দেখিলেই ব্রাহ্মণরা অপবিত্র হইয়া যাইতেন ; কোন কোন লোকের সংগে এক রাস্তায় চলাও তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। আচার্যদেব সন্ন্যাসী হইলেও ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিয়াছিলেন এবং যে সব সন্ন্যাসী শিষ্য তাঁহার সংগে ছিলেন, তাঁহারাও ছিলেন ব্রাহ্মণ জাতীয়। তাই অভ্যাসবশতঃ, ছুৎ-মার্গের কিছু সংস্কার তাঁহাদের মধ্যে থাকা কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। তাই বুঝি, ভগবানের ইচ্ছায়, নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

তিরুভেলীতিরু নগরীর পথে, একদিন এক নিচ জাতীয় রমণীর সহিত আচার্যদেবের সাক্ষাৎ হয়। তিনি দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াই, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাহাকে রাস্তা ছাড়িয়া সরিয়া যাইতে বলিলেন। সে উত্তর দিল, "সব দিকেই দেবতার মন্দির ; যে দিকেই যাইব, স্থান অপবিত্র হইবে ; এখন কোন্ দিকে যাইব, আপনি বলিয়া দিন।" রমণীর কথা শুনিবা মাত্র, রামানুজ, সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময় দেখিয়া, লজ্জিত হইলেন এবং রমণীকে নমস্কার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

আচার্যদেব সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে ভারতের পশ্চিম উপকূল দিয়া, উত্তর

মুখে তীর্থ-পরিক্রমা ও ধর্মপ্রচার করিতে করিতে হিমালয়ে বদরীনারায়ণ প্রভৃতি দর্শন করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার পণ্ডিত-দিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার করিলেন। এইরূপে, উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ নগরীতে বৈষ্ণব মত প্রচার করিয়া পুরীধাম হইয়া, তিনি শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন।

সমগ্র ভারতে বৈষ্ণব মত প্রচার করিয়া আচার্যদেব শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলে, বৈষ্ণবদের আনন্দের সীমা রহিল না। বৈষ্ণব পর্ব উপলক্ষে, উৎসবের আড়ম্বর খুব বাড়িয়া গেল। সমস্ত দেশের লোক সর্বদা আচার্যদেবের চরিত-কথা ও উপদেশসমূহ আলোচনা করিয়া, ধন্য হইতে লাগিল।

(৩)

রামানুজের ধর্ম

মহাপুরুষদের প্রচারিত ধর্মমত বুঝিতে হইলে, তাঁহাদের সমসাময়িক লোক-সমাজের মানসিক অবস্থা ভালরূপে জানা প্রয়োজন। তাহা না জানিলে মনে হইবে, তাঁহাদের জ্ঞান বুঝি অসম্পূর্ণ ছিল, তাই এক একজন এক এক দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন বোধ হইবে। যেমন, কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ কর্মের, বুদ্ধদেব সন্ন্যাসের, শঙ্করাচার্য জ্ঞানের এবং আচার্য রামানুজ ও চৈতন্যদেব ভক্তির গোঁড়া ছিলেন। ইঁহারা সকলেই ভগবানের আদেশে ধর্ম প্রচার করিয়া ছিলেন। সুতরাং, ইঁহাদের শিক্ষায় ভ্রম থাকিতে পারে না। তবে ইঁহারা এক এক দিকে এত জোর দিয়াছেন কেন? তাহার সুস্পষ্ট কারণ এই যে, মানুষের যখন যে ভাবের যত বেশি অভাব হয়, মহাপুরুষগণ সেই ভাবের দিকে তাঁহাদের মন তত বেশি আকর্ষণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যদি মুক্তি চাও, তবে নিষ্কাম ভাবে কর্ম কর। কিছু-দিন যাইতে না যাইতে, মানুষ মুক্তির কথা ভুলিয়া গেল ; আর, নিষ্কাম হইতে যাইয়া, উদ্দেশ্য-হীন কর্ম করিতে লাগিল—যাহাকে বলে, 'ভূতের বেগার খাটা'। তখন ধর্মের ক্রিয়া ছিল, কিন্তু 'ধর্মচিন্তা' ছিল না। বুদ্ধদেবকে বাধ্য হইয়া ঐ চিন্তাহীন কর্মের ধর্মকে একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি চিন্তার ধর্ম প্রচার করিয়া, মানুষকে জড়ত্ব প্রাপ্তি হইতে রক্ষা করিলেন।

পরবর্তী কালে লোকে, বুদ্ধদেবের দোহাই দিয়া মুখে নির্বাণ নির্বাণ বলিলেও, কার্যতঃ সকল বিষয়ে কেবলই সংসারভোগের ব্যবস্থা করিত। নির্বাণ মুক্তি'তো দূরের কথা, পরকালের ভয়-ভাবনাও তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কুমারিল ভট্ট বেদের কর্মকাণ্ডের উপর অত্যন্ত ঝোঁক দিলেন। তাহাতে কদাচার নিবৃত্ত হইল; লোকে ধর্মপথে চলিতে এবং ইহ-পরকালের মঙ্গল চিন্তা করিতে শিখিল। কিন্তু চিন্তাশীল লোকেরা আচার ও কর্মপ্রধান ধর্মে তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার সংশয় তাঁহাদের মনকে পীড়িত করিতে লাগিল। তখন আচার্য শঙ্কর অবতীর্ণ হইয়া চিন্তাশীলদের জন্য বৈদিক জ্ঞানযোগ ও সর্বসাধারণের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচার করিলেন। এই উভয়ের প্রচারের ফলে, বৌদ্ধ বিপ্লবে যে যথেচ্ছাচার দেশে আসিয়াছিল, তাহা দূর হইল।

বৈদিক বিধানে কর্ম অতি অল্প লোকই করিতে পারে এবং জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিবার অধিকারী সংসারে দুর্লভ। সুতরাং, কুমারিল ও শঙ্কর প্রচারিত ধর্ম উচ্চবর্ণের ও উচ্চশিক্ষিতের ধর্ম হইয়া রহিল; সর্বসাধারণের তাহাতে বিশেষ উপকার হইল না। দেখিতে দেখিতে, আবার সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইল। জ্ঞানযোগের কথা আলোচনা করিলে একপ্রকার আনন্দ হয়; কিন্তু ঐ যোগ অভ্যাস করিয়া ফল প্রত্যক্ষ করা অত্যন্তই কঠিন। সেই কঠিন পথে কেহ প্রায় চলিতে চাহিত না; কেবল কতকগুলি মত জানিয়াই নিজেকে জ্ঞানী মনে করিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইত। তাহারা মানলাভের জন্য জ্ঞানীর ভান করিয়া লোকের নিকট প্রচার করিত যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এই জগৎ একান্ত মিথ্যা। এই কথার অর্থ কেহ না বুঝিলেও, ভক্তি উপাসনা, ধর্মকর্ম, ভগবান্, পরকাল, স্বর্গ-নরক, সবই মিথ্যা মনে করিয়া, ঐ সব বিষয়ে মাথা ঘামাইত না; যথেচ্ছভাবে জীবন যাপন করাই কর্তব্য ভাবিত। এই সময়ে আচার্য রামানুজ জ্ঞান ও কর্মের সহিত ভক্তি মিশাইয়া সর্ব মানবের উপযোগী এক ধর্মমত প্রচার করিলেন। তাহার ফলে সর্বগ্রাহী বৈদিক ধর্ম আপন মহিমায় সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল।

রামানুজ প্রচার করিলেন, ভগবান্ পরম করুণাময়, সর্বব্যাপী ও সকল গুণের আধার। জীব তাঁহার অংশ। অন্যায় কর্ম করাতে জীবের স্বরূপ-জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া, সে ঈশ্বরকে জানিতে পারে না। ভক্তির সহিত

উপাসনা করিলে, সে নিজের ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও পরস্পর সেব্য-সেবক সম্বন্ধ জানিতে পারে। তখন, তাহার আর জন্ম হয় না এবং মৃত্যুর পর, সে, পরম আনন্দে, চিরকাল, নারায়ণের নিকট বাস করে। এই ধর্মে সকলের সমান অধিকার ; তবে, খুব পবিত্র ভাবে থাকিতে হয় ; আহার বিহারে শাস্ত্রের নিয়ম সর্বতোভাবে মানিয়া চলিতে হয়।

রামানুজ ও তাঁহার শিষ্যগণের মহৎ চরিত্র, ত্যাগ ও তপস্যা প্রভাবে ভারতে এক সর্বব্যাপী ভক্তির আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে, অধিকাংশ আচার্য ভক্তিমূলক ধর্ম প্রচার করিয়া, ভারতবর্ষকে ধর্ম বিষয়ে এখনও জগতের শিক্ষার স্থল করিয়া রাখিয়াছেন।

(৪)

ধনুর্দাস

শ্রীরঙ্গমে মহোৎসব। বহু স্থানের শত শত লোক মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছে। একজন অসামান্য সুন্দরী রমণী উৎসব ক্ষেত্রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আর সর্বাপেক্ষা বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করিল ঐ রমণীতে আসক্ত জনৈক যুবক। সে মেয়েটির মাথায় ছাতি ধরিয়া, দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল। এই অদ্ভুত দৃশ্য যেন জন-সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। ইহা আচার্য-দেবেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি, জনৈক সেবক পাঠাইয়া, যুবকটিকে ডাকাইয়া আনিলেন। তারপর, তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে নিম্নলিখিত কথা-বার্তা হইল।

রামানুজ—তুমি, ঘৃণা লজ্জা ত্যাগ করিয়া এই রমণীর সঙ্গে এইরূপ ঘুরিতেছ কেন?

যুবক—আমি ইহার চোখে এমন এক সৌন্দর্য দেখি, যাহার সঙ্গে জগতের আর কোন রূপের তুলনা হয় না। ইহার চোখ দেখিলে আমি জগৎ ভুলিয়া যাই।

রামানুজ—আমি যদি তোমার স্ত্রীর চোখ হইতে আরও সুন্দর চোখ দেখাইতে পারি, তবে তুমি তাহা আরও বেশি ভালবাসিবে?

যুবক—প্রভু, আমার স্ত্রীর চোখ অপেক্ষা বেশি সুন্দর চোখ আছে বলিয়া

মনে হয় না। যদি আপনি তেমন চোখ দেখাইতে পারেন, তবে অবশ্যই তাহা আমার বেশি ভাল লাগিবে।

রামানুজ—আচ্ছা, তুমি আজ সন্ধ্যায় আবার আমার সঙ্গে দেখা করিও।

লোকটির নাম ধনুর্দাস, সে ছিল মল্লবিদ্যায় নিপুণ। আর, স্ত্রীলোকটির নাম হেমাম্বা। ধনুর্দাস সত্য সত্যই সন্ধ্যাকালে আচার্যদেবের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে লইয়া মন্দিরে আরাত্রিক দর্শন করিতে গেলেন। আরতি দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া, ধনুর্দাস রঙ্গনাথের চোখে এমন অলৌকিক সৌন্দর্য দেখিতে পাইল যে, আনন্দে তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল ; আর চোখ হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। রামানুজের কৃপায় এইরূপ দুর্লভ দেব-দর্শন লাভ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, সে তাঁহার চরণে শরণ নিল। তাহার স্ত্রী হেমাম্বাও আচার্যদেবের শিষ্যা হইল।

এই প্রেমিক প্রেমিকা অল্পকাল মধ্যেই ভগবানের ভাবে তন্ময় হইয়া গেল। আচার্যদেবও তাহাদিগকে খুব স্নেহ করিতে লাগিলেন। এই হীন জাতীয় দম্পতির উপর তাঁহার স্নেহাধিক্য, সন্ন্যাসী শিষ্যগণের ভাল বোধ হইল না। এই বিষয় নিয়া বেশ একটু সমালোচনা হইতে লাগিল। আচার্য নীরব থাকিয়া, শিষ্যদের বুদ্ধি সংশোধন করিবার সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদিন রাত্রে, আচার্যদেব গোপনে শিষ্যদের বহির্বাস ছিঁড়িয়া রাখিলেন। পরদিন ভোরে, শিষ্যগণ নিজ নিজ বস্ত্রের এই দশা দেখিয়া, পরস্পরকে দোষী মনে করিয়া, বিষম কলহ করিতে লাগিলেন। অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল যে, আচার্যদেবকে স্বয়ং যাইয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে হইল।

দুইএক দিন পর, আচার্যদেব শিষ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন যে, হেমাম্বা ও ধনুর্দাস বড় ভক্তি ও ত্যাগের ভাব দেখায়, তাহা সত্য কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ; হেমাম্বার অনেক স্বর্ণালঙ্কার আছে, তাহা গোপনে সরাইয়া লইয়া আসিলে তাহারা কি করে দেখা যাইবে। গুরুদেবের এই অদ্ভুত প্রস্তাবে শিষ্যগণ খুব আমোদ অনুভব করিলেন এবং তাহা কার্যে পরিণত করিতে পরম উৎসাহের সহিত প্রস্তুত হইলেন।

কয়েকদিন পর, একদিন আচার্য হেমাম্বাকে বলিলেন, "মা, তুমি তো দেহ-

মন-প্রাণ ভগবান্‌কে দিয়াছ ; তোমার অনেক সোনার অলঙ্কার আছে, তাহা দ্বারা এই ভগবানের দেহ সাজাইয়া রাখ।” গুরুর আদেশে, ঘরে যা কিছু অলঙ্কার ছিল সব পরিয়া, হেমাম্বা বেশ সাজিয়া গুজিয়া রহিল। সেই দিন সন্ধ্যারতির পর ধনুর্দাস আসিলে, গুরুদেব তাহার সঙ্গে অনেক ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন। কথায় কথায় অনেক রাত্রি হইয়া গেল। স্বামীর বিলম্ব দেখিয়া হেমাম্বা ঘুমাইয়া পড়িল। গুরুদেবের ইঙ্গিতে শিষ্যগণ হেমাম্বার ঘরের নিকট ছিলেন ; হেমাম্বা ঘুমাইতেছে দেখিয়া, তাহারা অতি সাবধানে তাহার অলংকারগুলি খুলিতে লাগিলেন। হেমাম্বা কাত হইয়া শুইয়া ছিল ; সে হঠাৎ অনুভব করিল যে, চোর তাহার অলঙ্কার চুরি করিতেছে। সে মনে মনে ভাবিল যে, গুরু কৃপা করিয়া অলংকারের বোঝা তাহার দেহ হইতে নামাইবেন বলিয়াই এই ব্যবস্থা বুঝি করিয়াছেন। তাই এক পাশের অলংকার খোলা হইয়া গেলে, অন্য পাশ ফিরাইয়া দিবার জন্য, যেন ঘুমের ঘোরে, সে পাশ ফিরিয়া শুইবার চেষ্টা করিল। শিষ্যগণ তাহাকে নড়িতে দেখিয়া, রস-ভঙ্গ হইবার ভয়ে পলাইয়া গেলেন। তাঁহারা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে, তাহাদের সাড়া পাইয়া আচার্যদেব ধনুর্দাসকে বিদায় দিলেন।

ধনুর্দাস চলিয়া গেলে, শিষ্যগণ সহর্ষে অলংকারগুলি আনিয়া গুরুর সম্মুখে রাখিলেন। অলংকার চুরি হওয়াতে ধনুর্দাস ও হেমাম্বাতে কিরূপ কথাবার্তা হয়, তাহা শুনিবার জন্য, আচার্যদেব আবার শিষ্যদের প্রেরণ করিলেন। শিষ্যগণ আড়ালে থাকিয়া, ভক্ত দম্পতির কথাবার্তা শুনিতে লাগিলেন।

ধনুর্দাস ঘরে ফিরিতেই, হেমাম্বা, খুব আনন্দের সহিত, অলংকার চুরির বিবরণ তাহাকে বলিতে লাগিল,—যেন খুব একটা আমোদের ব্যাপার ঘটিয়াছে। চোর যে অর্ধেক অলংকার নিতে পারে নাই, সেই জন্য সে স্বামীর নিকট দুঃখ প্রকাশ করিল। ধনুর্দাস বলিল, “তোমার আমি-আমার বুদ্ধি এখনও গেল না। প্রভুর বস্তু প্রভু নিতেছেন, তাতে আবার তুমি পাশ ফিরিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে গেলে কেন? এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যিনি চালাইতেছেন, এই অলংকারগুলি খুলিয়া নিতে কি তোমার সাহায্যের তাঁর প্রয়োজন ছিল? 'আমার দেহ' 'আমার অলংকার' এই জ্ঞান এখনও রহিয়াছে বলিয়া তোমার অর্ধেক বন্ধন কাটিল না।”

শিষ্যগণ ভাবিয়াছিলেন, মূল্যবান অলংকার চুরি হওয়াতে ইঁহারা কতই না দুঃখ পাইবেন; কিন্তু ইঁহাদের বিপরীত আচরণে তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে, গুরুদেব সকল শিষ্যকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং ভক্ত দম্পতির আচরণের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই অব্রাহ্মণ গৃহস্থ দম্পতির ত্যাগ, বৈরাগ্য ও গুরুভক্তি এবং ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী হইয়াও তাঁহাদের সামান্য কাপড় নিয়া কলহ এবং গুরুর কার্যে সংশয়ের কথা আলোচনা করিয়া শিষ্যগণ অতিশয় লজ্জিত হইলেন। আচার্যদেব যে সর্বজ্ঞ ও পরম করুণাময়, তাহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার চরণে পড়িয়া, সকলে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

(৫)

শ্রীসম্প্রদায়

আচার্য রামানুজ প্রবর্তিত সম্প্রদায়ে, ভগবান্ নারায়ণ রূপে উপাসিত। নারায়ণের শক্তি শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর নামে এই সম্প্রদায় শ্রীসম্প্রদায় নামে পরিচিত।

সমগ্র ভারতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ফলে, একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় গঠিত হইল। আচার্যদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ সকলেই বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের অবর্তমানে এই বৃহৎ সম্প্রদায়ে ঐক্য রক্ষা সুকঠিন হইবে; আর প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের আক্রমণ হইতে বৈষ্ণব মত রক্ষা করিতে হইলে, অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন। যামুনাচার্যের ন্যায়, আচার্য রামানুজও ভগবানের নিকট উপযুক্ত লোক প্রেরণের জন্য আকুল প্রার্থনা জানাইলেন। কিছুদিন পরে, কুরেশের দুইটি পুত্র ও গোবিন্দের ভাই বালগোবিন্দের একটি পুত্র জন্মিল। আচার্য জানিতে পারিলেন, ইহারা সম্প্রদায় রক্ষার জন্য ভগবৎ প্রেরিত পুরুষ। শৈশবেই তিনি ইহাদিগকে দীক্ষিত করিলেন এবং কুরেশের দুই পুত্রের নাম রাখিলেন পরাশর ও বেদব্যাস এবং বালগোবিন্দের পুত্রের নাম হইল পরাঙ্কুশ-পূর্ণাচার্য।

শিশুকাল হইতেই, বালক তিনটি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে থাকিল। পরাশরের বয়স যখন চারি বৎসর মাত্র, তখন সে একদিন রাস্তায়

ধূলা-খেলা করিতেছিল। সেই সময় দেখা গেল, ঢাক ঢোল বাজাইয়া একদল লোক আসিতেছে। নগরের লোক কৌতূহলী হইয়া ছুটিয়া আসাতে, রাজ-পথে বেশ জনতা হইল। শুনা গেল, জনৈক পণ্ডিত উত্তর ভারতের সকল পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া সর্বজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন; তিনি এখন রামানুজের সহিত বিচার করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে, গরুর গাড়িতে বোঝাই করা অনেক পুঁথি ও অনেক শিষ্য। বালক, লোকের মুখে 'সর্বজ্ঞ' কথাটার অর্থ শুনিল, 'যিনি সবই জানেন'। পণ্ডিত পাল্‌কী চড়িয়া নিকটে আসিলে, পরাশর এক মুঠা ধূলা হাতে লইয়া, ভিড়ের ফাঁকে, তাঁহার নিকট-বর্তী হইয়া, ধূলা মুঠা দেখাইয়া বলিল, "মহাশয়, আপনি তো সবই জানেন; বলুন দেখি, আমার হাতে কয়টা বালি আছে?" ভিড় ঠেলিয়া পাল্‌কী ধীরে ধীরে চলিতেছিল; সর্বজ্ঞ আমোদ ছলে বালকের সঙ্গে দুই একটি কথা বলিয়া বুঝিলেন, ইহা শিখানো কথা নহে, বালকটি সত্য সত্যই অসামান্য প্রতিভাশালী। তিনি তাহার পরিচয় নিয়া জানিলেন, সে রামানুজের শিষ্যের সন্তান। এই সামান্য ঘটনায় পণ্ডিতের মনে বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত হইল। তিনি আচার্যকে বিচারে পরাজিত করিবার দুর্বাসনা ত্যাগ করিয়া, জ্ঞান লাভের জন্য তাঁহার শিষ্য হইলেন।

এইরূপে নিত্যই বালক তিনটি এমন সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগিল যে, বৈষ্ণবসমাজ তাহাদিগকে ভবিষ্য নেতা রূপে অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

(১)

আচার্যের উদারতা

সাধারণতঃ লোকের ধারণা, বৈষ্ণব ধর্ম গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, জগতে প্রচলিত কোনও ধর্মই এই দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। নিজের সম্প্রদায়ের গৌরব ও অন্য সম্প্রদায়ের হীনতা সকল ধর্মাবলম্বীরা সমভাবে ঘোষণা করিয়া থাকেন।

শুধু ধর্ম সম্বন্ধেই যে মানব-মনের এই দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তাহা নহে ; স্বজাতির ভাষা, আচার ব্যবহার, খাদ্য বস্তু, এমন-কি দেহের বর্ণ ও গঠন এবং পোশাক-পরিচ্ছদে, মানুষ সৌন্দর্য মাধুর্য দেখিতে পায় ; কিন্তু অন্য জাতির ঐগুলির নিন্দাই করিয়া থাকে। মানব-বুদ্ধির অপূর্ণতাই তাহার সর্ববিধ গোঁড়ামির জন্য দায়ী ; কোনও ধর্মবিশেষকে এই জন্য দোষী মনে করিলে অত্যন্ত ভুল করা হয়।

ধর্ম ব্যতীত এই ভেদবুদ্ধি দূর করিবার উত্তম উপায় আর নাই। সকল ধর্মের, মূল তত্ত্ব লক্ষ্য করিলে, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, মনের যে মলিনতা হইতে ভেদবুদ্ধির উৎপত্তি, সেই মলিনতা দূর করাই ধর্ম সমূহের একমাত্র উদ্দেশ্য। দেখা যায়, যাঁহারা যথারীতি সাধন ভজন করেন, সকল ধর্মের সেই সব সাধক, ক্রমে ক্রমে ভেদ-দৃষ্টি রহিত হইয়া উদারতার চরম সীমায় উপস্থিত হন।

সকল ধর্মের প্রবর্তকগণই এক বাক্যে বলিয়াছেন, অনন্য মনে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিলে সকল দুর্বলতার হাত হইতে মানুষ নিষ্কৃতি পাইবে। কিন্তু মানুষ স্বধর্মে অনন্যমন না হইয়া, অন্য পথের দোষ ঘোষণা ও নিজ মতের গৌরব ব্যাখ্যায় শক্তি ক্ষয় করে, পথে চলা আর হইয়া উঠে না। তাহা হইতেই গোঁড়ামি ও ধর্ম-বিদ্বেষের উৎপত্তি।

বাল্যকাল হইতেই আচার্য রামানুজের উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। শৈশবে তিনি শূদ্র কাঞ্চীপূর্ণকে ভক্তি করিতেন, সেবা করিতেন। যৌবনে

আত্মোন্নতির জন্য, সেই মহাপুরুষের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। আচার্যরূপে ধর্ম প্রচার কালে, যে কোনও জাতীয় ব্যক্তি বৈষ্ণব সদাচার গ্রহণ করিলে, তাহাকে নিজ সম্প্রদায়ে গ্রহণ করিতেন।

শ্রীরঙ্গমে জনৈক শূদ্র বৈষ্ণবের মৃত্যু হইলে, আচার্যের গুরু মহাপূর্ণ ব্রাহ্মণদের নিয়ম অনুসারে তাহার দেহের সৎকার করেন। ইহার প্রতিবাদ করিয়া গোঁড়ারা খুব একটা আন্দোলন উপস্থিত করে। পণ্ডিত মহাপূর্ণ নিজ কার্য সমর্থন করিয়া অনেক শাস্ত্র-প্রমাণ দেখাইলেও গোঁড়ারা নিরস্ত হইল না। আচার্যদেব গুরুর পক্ষ সমর্থন করিয়া বিবাদ ভঞ্জন করেন।

বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারকদের উদারতায় ব্যাধ প্রভৃতি অনেক অনুন্নত জাতি বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সদাচার-সম্পন্ন হইয়াছিল।

(২)

কৃমিকণ্ঠ

ধর্মের মূল, সাধনা। সাধনাহীন সম্প্রদায় ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। শৈবগণ সাধনা ছাড়িয়া দলাদলি ও সামাজিকতা নিয়া ব্যস্ত থাকিতেন। বৈষ্ণবগণ সাধনাবলে যতই সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন, শৈবগণ ততই বৃথা ঈর্ষায় জ্বলিয়া আরও দুর্বল হইতে লাগিলেন।

তখন কাঞ্চীপুর ছিল চোল রাজ্যের রাজধানী ; শ্রীরঙ্গমও চোল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বৃদ্ধ চোল-রাজের মৃত্যু হইলে, তাঁহার মূর্খ, নিষ্ঠুর ও পাপাত্মা পুত্র কৃমিকণ্ঠ সিংহাসনে বসিল। সুযোগ পাইয়া দুষ্ট শৈবগণ চাটু বাক্যে তাহাকে বশ করিল এবং বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিল। কৃমিকণ্ঠ রাজ্যে ঘোষণা করিল যে, তাহার রাজ্যে সকলকেই শৈব হইতে হইবে ; শুধু তাহা-ই নহে, প্রত্যেককে লিখিয়া দিতে হইবে, 'শিবাৎ পরতরং ন হি' অর্থাৎ শিব হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। এইরূপ লিখিয়া দিতে অসম্মত হইয়া, অনেক বৈষ্ণব কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। দুষ্ট রাজা ভাবিল, "রামানুজটাই যত নষ্টের গোড়া, উহাকে দিয়া লিখাইয়া লইলেই সব বৈষ্ণব জব্দ হইবে ; আর, সে যদি লিখিতে সম্মত না হয়, তাহাকে মারিয়া ফেলিলেই সব বৈষ্ণব ভয়ে শৈব ধর্ম গ্রহণ করিবে।"

রাজা রামানুজকে ধরিয়া আনিবার জন্য শ্রীরঙ্গমে সৈন্য পাঠাইল। এই সংবাদ পাইয়া, আচার্যদেবকে রক্ষা করিবার জন্য শিষ্যগণ অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের প্রবল আগ্রহে বাধ্য হইয়া আচার্যদেব, গৃহস্থের বেশ ধারণ করিয়া, শ্রীরঙ্গম হইতে পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলেন। তাঁহাকে পথে রক্ষা করিবার জন্য, কয়েকজন শিষ্যও সঙ্গে গেলেন।

রাজার সৈন্যগণ শ্রীরঙ্গমে আসিয়া রামানুজের মঠে উপস্থিত হইল। কুরেশ আচার্যের বেশ ধারণ করিয়া, ধৃত হইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সৈন্যগণ রামানুজ মনে করিয়া কুরেশকে ধরিয়া লইয়া গেল। রাজসভায় উপস্থিত হইলে, পণ্ডিতগণও রামানুজ মনে করিয়া কুরেশকে শাস্ত্রীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মহাপণ্ডিত শ্রুতিধর কুরেশের সঙ্গে বিচার করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না ; শৈব পণ্ডিতগণ কিছুক্ষণ তর্ক করিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "হে বৈষ্ণব, যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে লিখিয়া দাও, 'শিবাৎ পরতরং ন হি'।" নির্ভীক কুরেশ হাস্য করিয়া উত্তর দিলেন, "দ্রোণমস্তি ততঃ পরম্"—অর্থাৎ দ্রোণ তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশের সের ও পশুরির* ন্যায় ঐ দেশে শিব ও দ্রোণ নামে দুইটি মাপ ছিল ; কুরেশ উপহাসের ছলে, শিব অর্থে দেবতা না বুঝিয়া যেন মাপ বুঝিতেছেন এইরূপ ভান করিয়া, শিব হইতে দ্রোণ যে বেশি এই কথাটা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

রাজা এই উপহাস শুনিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার আদেশে, ঘাতকগণ, কুরেশকে মশানে লইয়া গিয়া, তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে কুরেশ স্থির হইয়া রহিলেন। শরীরের উপর তাঁহার 'আমি' বুদ্ধি ছিল না ; তিনি সকলের ভিতর তাঁহার ইষ্ট দেবতা বিষ্ণুকে দেখিতে পাইতেন ; তাই, ঘাতকদিগকে নারায়ণ জ্ঞানে প্রণাম করিলেন। ঘাতকগণ ব্রহ্মতেজে দীপ্তিমান কুরেশের ব্যবহারে ভয় পাইল এবং লোক সঙ্গে দিয়া চক্ষুহীন কুরেশকে শ্রীরঙ্গমে পাঠাইয়া দিল।

---

* পশুরি—আগেকার দিনে পাঁচ সের ওজনের বাটখারা।

(৩)

নির্বাসিত

আচার্যদেব ছদ্মবেশে পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিলেন। দাশরথি, গোবিন্দ ও ধনুর্দাস তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া, চোল রাজ্যের বাহিরে যাইবার জন্য, অবিরত চলিতে চলিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ষষ্ঠ দিবস রাত্রে ভয়ানক বৃষ্টি হইতে লাগিল। তাঁহারা তখন নীলগিরির নিকট এক ব্যাধের বাড়িতে আশ্রয় লইলেন।

তখন দক্ষিণাপথে আচার্যের কথা জানিত না এমন লোক বিরল ছিল। ঐ গ্রামের ব্যাধগণ জনৈক ভক্ত কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। তাহারা যখন আচার্যের পরিচয় পাইল, তখন তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। ফলমূল, মধু প্রভৃতি যাহা কিছু বনে পাওয়া যায়, তাহা দিয়া তাহারা সশিষ্য আচার্যদেবের সেবা করিতে লাগিল। তিনি কয়েক দিন তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া বিশ্রাম করিলেন। ব্যাধগণও তাঁহার সঙ্গ পাইয়া ধন্য হইল।

আচার্যদেব অনেক দিন অন্ন গ্রহণ করেন নাই। তাই ব্যাধগণ নিকটবর্তী এক গ্রামে তাহাদের পরিচিত রঙ্গদাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়িতে তাঁহাকে লইয়া গেল। সেই ব্রাহ্মণের স্ত্রী শ্রীরঙ্গমে যাইয়া আচার্যের নিকট পূর্বেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অসম্ভাবিত রূপে গুরুদেবকে গৃহে উপস্থিত দেখিয়া, প্রাণপণ যত্নে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

আগুন কখনও লুকাইয়া রাখা যায় না। আচার্যদেবের আগমন বার্তা, সেই দেশে, অল্প দিন মধ্যে, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহাকে দর্শন করিতে ও উপদেশ শ্রবণ করিতে, সকল শ্রেণীর লোক, দলে দলে, তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। তিনিও স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইয়া, ভগবদ্ভক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন। বিশেষ আগ্রহান্বিত অনেকে তাঁহার নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইল।

আচার্যদেব দ্বাদশ বৎসর ঐ অঞ্চলে ছিলেন। সেই দেশের লোককে উদ্ধার করিবার জন্যই যেন, ভগবানের ইচ্ছায় তিনি নির্বাসিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র প্রভাবে লোক সদাচার, সত্যনিষ্ঠা, ভগবানের উপাসনা প্রভৃতি সদ্গুণের অনুশীলন করিয়া যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিল।

(৪)

প্রত্যাবর্তন

জ্ঞানিগণ বলেন, পূর্বকর্মফলে জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে। কবে যে এই কর্ম আরম্ভ হইয়াছিল, কেহ তাহা জানিতে পারে না। পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত কর্মের কতক অংশ ভোগ করিবার জন্য, জীব একটি দেহ ধারণ করে। আবার সেই জন্মে কৃত কর্মের ফল তৎক্ষণাৎ ভোগ হয় না, তাহা সঞ্চিত থাকে ; পরে কোনও জন্মে জীব সেই কর্মের ফল ভোগ করে। কিন্তু কোনও উৎকট পাপ বা পুণ্য করিলে, তাহার ফল এই জন্মেই ভোগ করিতে হয়।

দুষ্ট কৃমিকণ্ঠ, নিরীহ, নিরপরাধ, জগতের মঙ্গলকারী মহাপুরুষগণকে যাতনা দিয়া যে মহাপাপ করিল, তাহার ফলে তাহার গলায় এমন বিষম ঘা হইল যে, তাহাতে কৃমিগণ কিলবিল করিতে লাগিল। লোকে তাহার নাম উচ্চারণ করিতে ঘৃণা বোধ করিত। কৃমিকণ্ঠ নামে সে পরিচিত হইল। অসহনীয় যাতনা ভোগ করিয়া সে দেহত্যাগ করে।

কৃমিকণ্ঠের দুষ্কার্যে তাহার আত্মীয়গণও উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাহার ভীষণ পরিণাম দেখিয়া সকলেই ভীত হইলেন। তাহার মৃত্যুর পর, তাহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, পরম সমাদরে সশিষ্য আচার্যদেবকে শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিতে আহ্বান করিল।

চোল-রাজপুত্রের আহ্বানে, আচার্যদেব দক্ষিণাঞ্চল হইতে শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিতে প্রস্তুত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া, যাদবাদ্রির ভক্তগণ তাঁহার বিরহ-ভয়ে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। আচার্যদেবের অভাব কিয়ৎ-পরিমাণে দূর করিবার জন্য, তাঁহারা তাঁহার এক অবিকল মূর্তি নির্মাণ করিয়া রাখিলেন।

দ্বাদশ বৎসর পরে আচার্যদেব আবার শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। এই কয়বৎসরে, শ্রীরঙ্গমের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। দুষ্ট রাজার ভয়ে বৈষ্ণবগণ শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করেন। শুধু দেব-সেবকগণ, অতি কষ্টে, শ্রীরঙ্গনাথের সেবা চালাইতে ছিলেন। নগরটি যেন অরণ্যে পরিণত হইয়া-ছিল। এখন আচার্যদেব ফিরিয়া আসিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া বৈষ্ণবগণ যে যেখানে ছিলেন, সকলেই, পরম উৎসাহে, শ্রীরঙ্গমে আসিয়া সমবেত হইলেন। ক্রমে পথঘাট ও মঠ মন্দিরের সংস্কার করা হইল। নগরটি পূর্বের ন্যায় আবার উৎসবময় হইয়া উঠিল।

(৫)

কুরেশের চক্ষু লাভ

কাহারও কাহারও মতে, কুরেশ রামানুজের বেশে রাজসৈন্য কর্তৃক ধৃত হইলে, আচার্যের শিষ্যবৎসল গুরু, ১০৫ বৎসর বয়স্ক অতিবৃদ্ধ মহাপূর্ণও তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন। ঘাতকগণ তাঁহারও চক্ষু উৎপাটিত করে ; তাহাতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। ঘাতকগণ কুরেশকে শ্রীরঙ্গমে পাঠাইয়া দেয় ; কিন্তু রাজার ভয়ে মন্দিরের পূজারীগণ তাঁহাকে তথায় স্থান দিলেন না। কুরেশ বৃষভাদ্রি নামক স্থানে যাইয়া ইষ্ট চিন্তায় মগ্ন হইলেন। আচার্য-দেব শ্রীরঙ্গমে আসিয়াই সর্বপ্রথম কুরেশকে ডাকিয়া আনাইলেন। তাঁহাকে রাজার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে গিয়া কুরেশের এই দুর্দশা আচার্যদেবের অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। তিনি একদিন কুরেশকে আদেশ করিলেন, "বৎস, তুমি কাঞ্চীপুরীতে গিয়া, শ্রীবরদরাজের চরণে চক্ষুর জন্য প্রার্থনা জানাও।" গুরুগতপ্রাণ কুরেশ গুরুর আদেশমতো, কাঞ্চীপুরে গেলেন বটে, কিন্তু, বরদরাজের মন্দিরে প্রবেশমাত্র প্রেমে বিভোর হইয়া, চক্ষু ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিলেন না ; বর চাহিলেন, যে ঘাতক তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিল, সে যেন মুক্তি পায়। কুরেশ গুরুর নিকট ফিরিয়া গিয়া এই ঘটনা নিবেদন করিলে আচার্যদেব তাঁহাকে আবার চক্ষু প্রার্থনা করিতে কাঞ্চী পাঠাইলেন। তিনি এবারও গুরুর আদেশ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন ; জ্ঞান-ভক্তি-মুক্তিদাতার নিকট ক্ষণস্থায়ী চক্ষুর জন্য প্রার্থনা করিতে তিনি অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিতে লাগিলেন। তিনি এবারও প্রার্থনা করিলেন, ক্রিমিকণ্ঠ যেন মুক্তি লাভ করে। শুনিয়া আচার্যদেব তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "বৎস, এইবার কিন্তু আমার আনন্দের জন্য, তুমি আমার আদেশ রক্ষা কর। আবার যাইয়া 'গুরুর আদেশে' চক্ষু ভিক্ষা করিয়া লও।" গুরুবাক্যের মান রক্ষা করিবার জন্য, এবার কুরেশ চক্ষু প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতে কুরেশের দৃষ্টিশক্তি পূর্ববৎ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইল।

এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া, ঘোর অবিশ্বাসীও ভক্ত ও ভক্তির মহিমায় বিশ্বাস লাভ করিয়া ধন্য হইল।

(৬)
অন্ত্যলীলা

আচার্যদেবের বয়স এখন ষাট বৎসর। তাঁহার অসাধারণ কার্যসমূহ দেখিয়া তাঁহাকে সকলেই দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতে লাগিল। তাঁহার অনুগ্রহে সহস্র সহস্র লোক জ্ঞান-ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইল। শ্রীরঙ্গম স্বর্গতুল্য আনন্দময় হইয়া উঠিল।

সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে দেহত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরাশর, বেদব্যাস ও পূর্ণাচার্য প্রভৃতি তরুণগণকে আচার্যদেব নিজে শিক্ষা দিয়া সঙ্ঘ পরিচালনে উপযুক্ত করিয়া তুলিলেন। তাহাদের মধ্যে পরাশরকে বিপুল বৈষ্ণব সম্প্রদায় শাসনে সমর্থ বিবেচনা করিয়া, সমাজের নায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

নির্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি আরও ষাট বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের ঘটনার বিবরণ কিছুই জানা যায় না। তবে, অন্যান্য মহাপুরুষ-দের কার্যাবলী আলোচনা করিয়া আমরা কতকগুলি বিষয় অনুমান করিতে পারি। দেখা যায়, কোনও দেশে মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিলে, তাঁহার প্রবল চিন্তা-তরঙ্গ প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্কে আঘাত করিয়া তাহাদের অন্তরের সুপ্ত সৎপ্রবৃত্তিগুলি জাগাইয়া তুলে। তখন কর্মীর কর্ম, চিন্তাশীলের চিন্তা, শুধু কল্যাণের পথেই চালিত হইতে থাকে। দেখা যায়, মহাপুরুষ-গণেরও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণের চরিত্রের সৌন্দর্য ও ঈশ্বরানুভূতির আনন্দ লক্ষ্য করিয়া, অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়, দলাদলির ভাব ছাড়িয়া, নিজ নিজ সাধনায় অধিকতর মনোযোগী হইয়া থাকে। এমন কি, ধর্ম-সাধকদের উৎসাহ, সংক্রামক হইয়া, শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য প্রভৃতি সংসারের কাজে কর্মীদের কর্মশীলতা বৃদ্ধি করে। এই রূপে মহাপুরুষদের আগমনে মানবসমাজের উন্নতির সকল রুদ্ধ-দ্বার খুলিয়া যায়।

আচার্য শঙ্করের পর, ভারতবাসীর জীবনে আচার্য রামানুজের আদর্শের প্রভাব অসামান্য ও অতি গভীর।

(৭)

দুইটি কাহিনী

মানুষের ভক্তি বিশ্বাস কত বিচিত্ররূপে যে আত্ম-প্রকাশ করে, নিম্নলিখিত ঘটনা দুইটি তাহার নিদর্শন।

(ক)

একজন সরল ব্রাহ্মণ, আচার্যের নিকট একদা তাঁহার কোনও প্রকার সেবা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আচার্যদেব তাঁহার নিকট এইরূপ একটি অদ্ভুত প্রস্তাব করেন যে, তিনি নিত্য সন্ধ্যা-পূজার পূর্বে, ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিতে চান ; প্রতিদিন পাদোদক দিলে, তাঁহার সব চেয়ে বেশি সেবা করা হইবে। সরল ব্রাহ্মণ তাহাতেই সম্মত হইলেন ; আচার্যদেবকে নিত্য নিজ পাদোদক দেওয়া তাঁহার একটি ব্রত হইল।

একদিন আচার্যদেব নিমন্ত্রিত হইয়া, এক ভক্ত গৃহে সমস্ত দিন যাপন করেন। রাত্রি এক প্রহরের সময়, মঠে ফিরিয়া আসিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, উক্ত ব্রাহ্মণটি, আজ পাদোদক দিয়া সেবা করিতে না পারায়, নিরাহারে সারাদিন তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। আচার্যদেব ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাদোদক গ্রহণ করিলেন ; তখন ব্রাহ্মণ, দিবসের কর্তব্য শেষ হইল ভাবিয়া, গৃহে ফিরিলেন।

এইরূপ নির্বিচার সেবার ভাব ও কর্তব্যনিষ্ঠা বড়ই দুর্লভ।

(খ)

একদিন একটি গোপ-বালিকা দধি বিক্রয় করিতে মঠে আসে। দধি ক্রয় করিয়া মূল্য দিতে একটু বিলম্ব হওয়াতে বালিকা তথায় অপেক্ষা করিতেছিল। এই সময় তাহাকে কিছু প্রসাদ খাইতে দেওয়া হয়। সাধুদিগকে, বিশেষতঃ আচার্যদেবকে দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হঠাৎ একটা অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল। সে দধির মূল্য লইতে অসম্মত হইল এবং তাহাকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আচার্যদেবকে মিনতি করিতে লাগিল। তাহার ছেলেমানুষি দেখিয়া, অনেক প্রকারে বুঝাইলেও সে কিছুতেই নিরস্ত হইল না। বালিকা

ক্রমেই যেন আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। কখন কখন দেখা যায়, পূর্ব জন্মের সংস্কার, কোন একটি সামান্য অনুকূল ঘটনা অবলম্বনে হঠাৎ জাগিয়া উঠে। সাধুরা ভাবিলেন, প্রসাদ ভক্ষণের ফলে ইহার পূর্বসংস্কার এইরূপ প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

তাহাকে কিছুতেই শান্ত করিতে না পারিয়া, আচার্যদেব বলিলেন যে, বেঙ্কটাচলে নারায়ণের নিকট গেলেই বালিকার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। আচার্যের উপর তাহার পূর্ণ বিশ্বাস ; সে বলিল, "তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন কেন! আপনি পত্র লিখিয়া দিন, আমি তাহা লইয়া নারায়ণের নিকট যাইব।" বালিকার সরলতায় মুগ্ধ হইয়া, আচার্যদেব এক পত্র লিখিয়া দিলেন।

কয়েক দিন পরে, সকলে শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে বালিকা বেংকটাচলে গিয়া নারায়ণের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে যে মাটিতে পড়িয়াছিল, আর উঠে নাই ; সমাধি যোগে তাহার দেহত্যাগ হইয়া গিয়াছে।

কঠোর সাধনায়ও যাহা লাভ করা সুকঠিন, শুধু বিশ্বাসের বলে, একটি মূর্খ বালিকা তাহা লাভ করিল।

(৮)

আচার্যদেবের বয়স ১২০ বৎসর পূর্ণ হইল। তিনি শীঘ্রই দেহত্যাগ করিবেন বুঝিতে পারিয়া, ভক্তগণ শ্রীরঙ্গমে একটি ও ভূতপুরীতে একটি, তাঁহার এই দুইটি মূর্তি স্থাপন করিলেন।

দেহত্যাগের দুই এক দিন পূর্বে, তিনি তাঁহার প্রচারিত ধর্মের সারমর্ম, সংক্ষেপে, সমবেত শিষ্যগণকে বুঝাইয়া দিলেন। ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে (শকাব্দ ১০৫৯), মাঘ মাসের শুক্লা দশমীর মধ্যাহ্ন কালে, গোবিন্দের কোলে মস্তক এবং আন্ধ্রপূর্ণের কোলে চরণদ্বয় রাখিয়া আচার্যদেব মহাসমাধি অবলম্বন করিলেন।

তাঁহার স্থূল দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল ; কিন্তু, মানবজাতির সম্মুখে তিনি যে মহান্ আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহা চিরকাল মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিবে।

—॰॰—